পকেট ভাবনা

- নীলুফার আমিন

মেয়েদের জামা–কাপড় পকেটহীন কেন? কথাটি ভাবতে ভাবতে অনেক দিন আগের ভুলে যাওয়া কিছু স্মৃতির কথা মনে পড়ে গেল।

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ পয়তাল্লিশ বছর আগের কথা। তখন মফস্বল শহরের প্রায় সব বাড়িই ছিল বিরাট জায়গা জুড়ে বিস্তৃত, আর থাকতো বড় বড় আম, জাম, লিচু, কাঠাল গাছে ঘেরা আঙিনা। আমাদের বাড়িটাও ছিল তেমনি। তাই আমাদের আঙিনা পরিষ্কার করার জন্য বাড়িতে একজন মহিলা ঝাড়ুদার আসতো। আমরা তাকে কেন জানি না জমাদারনি বলে ডাকতাম।

বেশ মোটাসোটা, কালো, হাসি–খুশি মধ্যবয়সী একজন মহিলা। তার পরনে থাকতো গাঢ় রঙের পৃন্ট শাড়ি। তার ব্লাউজটি ছিল বেশ আকর্ষণীয়। অনেকটা ছোট ফতুয়া টাইপের দেখতে। দুই পাশের ঝুলে দুটি পকেট থাকতো। হাতা, পকেট ও হাই কলারে থাকতো কালো বর্ডার। বেশ লাগতো দেখতে সেই ব্লাউজ।

বাড়িতে বাড়িতে ঝাড়ু দিয়ে যে টাকা পেতো তা এ পকেটেই গুজে রাখতো দেখতাম। এক পকেটে থাকতো টাকা, আরেক পকেটে থাকতো পান দোকতা।

আমার মায়ের ব্লাউজে এমন পকেট নেই কেন তা সেই অল্প বয়সেই আমাকে ভাবিয়ে তুলতো। জমাদারনির কোমরে একটি ছোট মগ বাধা থাকতো। তারা দল বেধে যখন–তখন চায়ের দোকানের পাশে বসে সেই মগে করে চা খেতো আর ওই ছোট্ট পকেট থেকে পয়সা বের করে দিতো দোকানিকে যা দেখতে আমার খুব ভালো লাগতো।

কেন জানি না ছোটবেলায় পকেটের প্রতি আমারও বেশ দুর্বলতা ছিল। দর্জির কাছে বায়না ধরলে অনেক কষ্টে সে ফ্রকের কোমরের কুচির ভেতরে একটা চোরা পকেট তৈরি করে দিতো যেন মেয়েদের জামার পকেটটা দেখা গেলে খুবই লজ্জার ব্যাপার হবে।

তারপর এক সময় সেই জমাদারনিদের দল কোথায় যেন হারিয়ে গেল শহর থেকে। ভুলে গেলাম তাদের সঙ্গে পকেটের কথা।

অনেক বছর পরে আমি একটি সেকেন্ডারি স্কুলের টিচার হিসেবে জয়েন করলাম। তখন সেই স্কুলের ড্রেসটি দেখে আবার খুশি হয়ে উঠলাম। মেয়েদের কোমরে কুচি দেয়া ফ্রকের বাম দিকে স্কুলের মনোগ্রামসহ একটি পকেট আছে যেখানে মেয়েরা একটি ছোট্ট রুমাল (টিসু পেপার ছিল না তখন) ও দুই একটা টাকা রাখতে পারতো।

মনে মনে হেডমিস্ট্রেসকে ধন্যবাদ দিলাম। ভাবলাম কচি শিশুদের মনের চাহিদা যে শিক্ষক উপলব্ধি করতে পারেন তিনিই তো সার্থক শিক্ষক।

ভাবছি আজকাল অনেক ফ্যাশন ডিজাইনারই মহিলা। মেয়েদের জামা–কাপড়ে পার্মানেন্টলি পকেট স্থাপনের প্রস্তাব রাখলে কেমন হয়?

লেখাটি এই পর্যন্ত লেখার পর আমার একটি পরিচিত মেয়ে এলো যে একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি করে। যাওয়ার সময় তাকে প্রয়োজনে কিছু টাকা হাতে দেয়ার পর দেখলাম সে পট করে পায়জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখে দিল।

বললাম, বাহ! তোমার পায়জামায় পকেট আছে?

হ্যা খালাম্মা আজকাল সবার পায়জামাতেই তো পকেট আছে।

বুঝলাম কিছু টাকা উপার্জন করছে বলেই পকেটের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। মেয়েদের পোশাক তাহলে আর পকেটবিহীন নেই বা থাকবে না? বিষয়টি ভাবতে বেশ ভালোই লাগছে। তবে তার জন্য চাই প্রত্যেক মেয়েদের নিজস্ব উপার্জন ক্ষমতা। তবেই না তা হেফাজতের জন্য পকেটের প্রয়োজন হবে, তাই না?

বনানী, ঢাকা থেকে

অতঃপর আনন্দ

– নুসরাত মিরা

বাবা ছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর। বাবাকে কখনোই দায়িত্ব অবহেলা করতে দেখিনি। বাবা সব সময় একটি উপদেশ দিতেন সময়ের কাজ সময়ে করার জন্য।

বাবাকে সব সময় ব্যস্ত থাকতে দেখি তার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। মাঝে মধ্যে বলেন, আমরা যদি এদের ঠিকমতো গড়তে না পারি তাহলে এরা মানুষ হবে কিভাবে?

এ রকম একজন আদর্শবান পিতার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়।

বাবা যদি কখনো মাকে কিছু উপদেশ দেন তাহলে মাকে বলতে শুনি, মাস্টারের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় এই হচ্ছে এক সমস্যা। তারা ঘরের বৌকেও ছাত্রী মনে করে।

মায়ের কথা শুনে বাবা হাসেন। কারণ বাবা জানেন, এ কথাটি মায়ের মনের কথা নয়। মা যে বাবাকে নিয়ে গর্ব করেন এটা আমরা যেমন জানি, বাবাও জানেন।

ছোটবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। সেটি হাটি হাটি পা পা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত। জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনে বাবাকে পাশে পেয়েছি। অন্যান্য ভাইবোনদের চেয়ে আমার প্রতি বাবার একটা আলাদা ভালোবাসা অনুভব করতাম।

সেই ছোটবেলার কথা। বাবাকে বললাম, আমরা এবারের ঈদ গ্রামে করবো।

বাবা রাজি হয়ে গেলেন। বাবা গ্রামের মানুষদের যে কি পরিমাণে ভালোবাসেন তা বলে বোঝানো যাবে না। আমাদের গ্রামে কোনো স্কুল ছিল না। মেয়েদের অভিভাবকরা অনেক দূরে স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করতে দিতেন না। তাই তাদের লেখাপড়া হতো না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাবা অনেক চেষ্টা করে একটি গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বাবা সব সময় বলেন, তোরা যেমন আমার সন্তান তেমনি ওই স্কুলটিও আমার আরেকটি সন্তান।

যাই হোক। সিদ্ধান্ত হলো আমরা ঈদ গ্রামে করবো।

শেষ রোজায় আমরা গ্রামে গেলাম। আমাদের দেখে সবাই তো মহাখুশি।

বাবার হাত ধরে গ্রামে ঘুরতে গেলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি একটি লোক তার মেয়েকে পেটাচ্ছে। বাবাকে দেখে লোকটি সালাম দিল।

বাবা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, ওকে এভাবে মারছিলে কেন?

দেখলাম মেয়েটি পাশে দাড়িয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদছে।

লোকটি বললো, স্যার, পেটে ভাত জোটে না, তার আবার ঈদের জামা। গরিবের আবার ঈদ!

বাবা বললেন, তোমার মেয়েকে নিয়ে সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি এসো।

লোকটি বললো, ঠিক আছে আসবো।

তারপর আমরা ওখান থেকে চলে আসি।

বাবা আমাকে বললেন, তোমার তো অনেকগুলো ড্রেস। কিন্তু দেখেছো ওর একটিও নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওদের আসতে বলেছো কেন? টাকা দেবে?

বাবা বললেন, না।

আমার প্রশ্নবোধক দৃষ্টি দেখে বাবা বলতে লাগলেন, এবার ঈদে তোমাকে যে ড্রেসটি কিনে দিয়েছি, তুমি সেই ড্রেসটি ওকে দিতে পারবে?

বাবা উত্তরের আশায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

বললাম, পারবো।

মনে মনে ভাবলাম, আমার তো ঈদের কয়েকটি জামা আছে।

আমার উত্তর শুনে বাবা সেদিন আমাকে খুব আদর করেছিলেন।

সন্ধ্যায় আমার নিজ হাতেই প্রিয় ড্রেসটি ওকে দিয়ে দিলাম।

ড্রেসটি পেয়ে ওর মুখে সেদিন আনন্দের যে বন্যা দেখেছিলাম তা চোখ বন্ধ করলে আজও আমি দেখতে পাই। গ্রামে ওটাই ছিল আমার প্রথম এবং শেষ ঈদ। এ ঈদের কথা কখনোই ভুলবো না। বাবা আমাদের দোয়া করো, আমরা যেন তোমারই মতো করে অসহায়দের পাশে দাড়াতে পারি।

পূর্ণ ঠিকানা বিহীন, বরিশাল থেকে

ক্রস- বাইট

– ওয়াহেদুজ্জামান

ল–লারা বলে লাফ দিয়ে ঘুম থেকে উঠে বসে জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকেন জর্জ ওয়াকার বুশ।

তাড়াতাড়ি বেড সুইচ অন করে বেডসাইড টেবিল থেকে পানির গ্লাস তুলে স্বামীর মুখে ধরেন ম্যাডাম লারা বুশ। আজ আবার স্বপ্ন দেখেছো?

হু। দ্যাট ব্লাডি মনস্টার এগেইন। হাপাতে হাপাতে কথাগুলো মুখ থেকে বের করেন।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কষ্ট লাগে লরার। হাসি–খুশি, প্রাণবন্ত কাউবয়টা কেন যে পলিটিক্স করতে এলো! কয়দিনেই যেন বুড়ো হয়ে গেল।

মুখের রেখায় ক্লান্তির ছাপ। ভালো করে কথা বলেন না। সারা দিন অন্যমনস্ক হয়ে কি সব ভাবতে থাকেন। রাতের বেলায় ঘুমাতে পারেন না। আজে–বাজে স্বপ্ন দেখে লাফ দিয়ে ঘুম থেকে উঠে বসেন। স্বামী কি তার রেগান চাচার মতো পাগল হয়ে যাচ্ছে? একবার কি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে তাকে নিয়ে যাবেন? কিন্তু লোক জানাজানির ভয়ে সে তো যেতে চাইবে না।

চোখ বন্ধ করলেই ভয়ংকর সব স্বপ্ন তাকে তাড়া করে বেড়ায়। খোলা তলোয়ার উচিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তার দিকে ধেয়ে আসছে লাদেন। কখনো বা জারকাওই ইয়া বড় চাকু হাতে তার গলায় পোচ দিতে যাচ্ছে। আবার কখনো স্বপ্নে দেখছে আটলান্টিকের মধ্যে থেকে বিরাট এক গডজিলা ক্যাটরিনার তাণ্ডব নিয়ে গ্রাস করতে আসছে হোয়াইট হাউসকে।

স্বপ্ন দেখলে বাকি রাতটুকু আর ঘুমাতে পারেন না বুশ। কয়েক হাজার নিউক্লিয়ার বোমা কিংবা এতো শখের হোম সিকিউরিটি কিছুই তাকে একটু নিশ্চিন্ত ঘুমের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

আজ আবার কি দেখলে? স্বামীর বুকে হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞাসা করলেন লরা।

ব্লাডি পেটি থিফ। ইয়া বড় ছুরি নিয়ে ... বলে নিজের গলায় হাত বোলান প্রেসিডেন্ট।

কথাটা শুনে হাসি পায় লরার। আসমানের বস্তিতে বেড়ে ওঠা জারকাওই যে কি না কৈশোরে সিঁধেল চোর হিসেবে অপরাধ জগতের হাতে খড়ি নিয়েছিল সেই জারকাওই আজ টেররিজম মনস্টার রূপে আবির্ভূত হয়েছে ইরাকে। দেড় লাখ সৈন্য তার একটা পিউবিক চুল পর্যন্ত ছিড়তে পারলো না। সিআইএ, এফবিআই–এর মতো ওজনদার অক্ষরগুলোকে হালকা পাতলা হাস্যকর করে দিল বিশ্ববাসীর কাছে। একটা ছিচকে চোরের জন্য গোটা আমেরিকার ইমেজ ডুবতে বসেছে।

স্বামীর ভুলের জন্য লরাকেও নানান রকম ব্যবস্থা বিদ্রূপ হজম করতে হয়।

আলকাতরার মতো কালো জেনিফার সেও তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, বুশ আমাদের প্রেস্টিজকে ফুশ করে পাংচার করে দিয়েছে।

বলার সময়ে মোটা ঠোট জোড়া এক সঙ্গে করে এমনভাবে *ফু-উ-শ* শব্দটা বের করে যেন পশ্চাদদেশ দিয়ে বাতাস বের করছে।

ছিঃ, কি বিশ্রী।

স্বামীর চুলে বিলি কেটে তাকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করেন লরা।

তুমি অতো ভেঙে পড়ো না তো, ইরাকে আমরা অবশ্যই উইন করবো। জারকাওই তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

লরার ইচ্ছা করে স্বামীকে টেনে বুকে তুলে নিতেন। কিন্তু ইদানীং লক্ষ্য করছেন, সেক্সের প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। কয়দিন আগে জন্মদিনের পোশাকে তৈরি হয়ে স্বামীকে কাছ টেনেছিলেন। কিন্তু কিছু না করে শুধু নিপল মুখে পুরে *মা মা* বলে ফুপিয়ে উঠেছিলেন। কি লজ্জার কথা! নিজের বৌকে কেউ মা ডাকে!

কিছু দিন থেকে লরার মাথার মধ্যে একটা বুদ্ধি ঘুরপাক খাচ্ছে। আজ সুযোগ পেয়ে বলে ফেলেন স্বামীকে। তার ডাক নাম, দুবাইয়া, বলে ডাকেন।

আচ্ছা দুবাইয়া, ইরাকে কি আমাদের স্ট্র্যাটেজি পাল্টাতে পারি না!

কেমন স্ট্র্যাটেজি? জানতে চান বুশ।

যেমন ধরো, আমরা ওখানে বেশি করে মহিলা সৈন্য পাঠাবো। আবু গারিব-এ তো দেখেছি আমাদের সার্ভিস উইমেনরা ইরাকি বন্দীদের পুরুষাঙ্গ নিয়ে খেলতে খুব মজা পেয়েছিল। এখন তুমি অর্ডার দেবে মহিলা সৈনিকরা ইরাকি পুরুষকে দেখা মাত্রই তাকে ন্যাংটো করে তার পুরুষাঙ্গ মুখে পুরে কচমচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। ব্যস, কয়েক বছরের মধ্যেই ইরাকিদের বংশ বিস্তার বন্ধ হয়ে যাবে। ওটা হবে একটা জনমানবহীন দেশ। তেল কূপ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। আমরা বিজয়ীর বেশে ফিরে আসবো।

আসলে তোমার মাথায় কাউডাং ছাড়া আর কিছু নেই। বিরক্ত হয়ে বলেন বুশ। হিউম্যান রাইটস গ্রুপ যে আমাকেই চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে, সে কথা ভেবেছো?

ইওর হিউম্যান রাইটাস। চোয়াল শক্ত করে বলেন লারা। আমরা প্রচার করবো দুষ্টু ইরাকিরা আমাদের সরলমতি মেয়েদের রেইপ করছিল। তাই বাধ্য হয়ে সেলফ ডিফেন্সে মেয়েরা পুরুষাঙ্গ খেয়ে ফেলেছে। ওটা এমন কোনো সুস্বাদু হটডগ নয় যে মজা করে তারা খাচ্ছে। স্রেফ খেয়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে। ফ্রেন্ডলি ফায়ারের বলি হয়ে লিনডা ইংল্যান্ড-এর মতো মহিলা সৈনিকরা পেট উচু করে যখন একে একে দেশে ফিরতে থাকবে তখন সেসব ছবি টেলিভিশনে প্রচার করবো। বুঝিয়ে দেবো, পিপ্পাপ মেয়েগুলোর কি হাল করেছে বজ্জাত ইরাকিরা। বিশ্ব জনমত তখন আমাদের ফেভারে চলে আসবে।

ইটস এ গুড আইডিয়া। এবার উৎসাহিত হয়ে বলেন বুশ।

দ্বিগুণ উৎসাহে লরা বললেন, বাবরকে ফলো করে আমরা এটার নাম দেবো ক্রস-বাইট (Cross-bite)।

বাবর! ভ্রূ কুচকে বলেন বুশ। হু ইজ বাবর? এমপেরর? যে তাজমহল বানিয়েছিল?

তাজমহল বানিয়েছিল এমপেরর শাহজাহান। বাবর ছিল প্রথম মোঘল সম্রাট। কিন্তু আমি যে বাবরের কথা বলছি সেই বাবর হচ্ছে ক্রস-ফায়ার (Cross-fire)-এর রচয়িতা। লরা বললেন।

ক্রস-ফায়ার? হোয়াটস দ্যাট? বুশ চোখ বড় করে জিজ্ঞাসা করলেন।

ক্রস-ফায়ার ইজ এ সুপার হিট প্লে। বাংলাদেশের ফেমাস নাটক।

দেশটার নাম শুনে আতকে উঠলেন বুশ।

ব্যাংলারড্যাশ? অ্যানাদার কানট্র হুইচ ইজ বিকামিং আফগানিস্তান? মোল্লারা যেখানে পপ কর্নের মতো বোমা ফাটায়? বুশ বিরস মুখে বললেন। বাংলাদেশের কথা বাদ দাও। ওদের নিয়ে পরে ভাবা যাবে। এবার বলো ক্রস-বাইটের স্ক্রিপ্ট কে লিখবে?

ভেরি সিম্পল, তুমি রাইসকে এ কাজের ভার দিয়ে দাও।

বৃলিয়ান্ট আইডিয়া। এক্ষুণি রাইসের সঙ্গে আলাপ করছি। ফোনটা দাও।

এতো রাতে হিজ ম্যাজেস্টির কল পেয়ে অবাক হন আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা সেক্রেটারি অফ স্টেট মিস কনডোলিৎসা রাইস।

লিডারের কাছে চিরকৃতজ্ঞ তিনি। বর্ণ বিচার না করে তার মতো এক কালা আওরাতকে বিশ্বের এক নাম্বার ক্ষমতাধর মহিলা বানিয়েছেন বুশ। কিছুটা হলেও সেই ঋণ তিনি শোধ করতে চান। সুযোগ পেয়ে মনের কথা তিনি বলে ফেলেন।

ব্যাপার কি স্যার! ম্যাডাম কি মায়ের বাড়ি গিয়েছেন? আমি আসবো নাকি?

বুশ বিরক্ত হয়ে বললেন, ওহ মনিকা ... সরি কনডি, ইউ নো আই অ্যাম নট লাইক বিল। আই অ্যাম এ পৃষ্ট (Priest), আই অ্যাম এ ক্রুসেডার।

নিজের ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে রাইস বললেন, আই অ্যাম সরি স্যার।

মনে মনে ভাবলেন লোকটা কি শেষ পর্যন্ত ইমপোটেন্ট হয়ে যাচ্ছে?

সউদি আরব থেকে

বিশ্বাস

আমার নাম ম। আমার সঙ্গে পরিচয় ছিল এক বড়ভাইয়ের, যার নাম র। প্রথমে সে আমাকে অফার করলো, ম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমি শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এ কি বলে! যাকে এতো শ্রদ্ধা, ভক্তি করি। আসলে পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ মানুষই এমন হয়।

যাক, ওনাকে বললাম, দেখুন রভাই, আপনাকে বড় ভাইয়ের মতো দেখি। আমার পক্ষে সম্ভব না।

ব্যস। ঘটনা এখান থেকেই শুরু।

পারিবারিকভাবে ওনার সঙ্গে আমার আব্বা আর আম্মার খুবই মিল। সব সময় ওনাকে নিয়ে আসেন আমাদের বাসায়। সেই সুবাদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আলাপ করতাম। বিভিন্ন প্রেম, রোমান্স, ভালোবাসার গল্প করতাম।

ওনার সঙ্গে আমার এগৃমেন্ট ছিল, আমি সব সময় ওনাকে সময় দেবো যতোদিন না পর্যন্ত আমার বিয়ে হয়।

আমাদের বাসায় মানুষজন একদম নেই বললেই চলে। আব্বা সারা দিন থাকেন বাইরে। আমার শ্রদ্ধেয় বড়ভাই এতোটাই পরিপক্ব ছিলেন, কখন বাসায় কে থাকবে, কে থাকবে না তা তিনি বুঝতেন। প্রায়ই তিনি আমার জন্য পুরি, সিঙাড়া, চকলেট, আচার নিয়ে আসতেন।

সেদিন দুপুর বারোটা। হঠাৎ রভাই হাজির। বাসায় কেউ নেই কেবল আমি ছাড়া।

এসেই বললেন ম, কিছু খাবে?

বললাম, অবশ্যই খাবো।

এই কথা বলার পর তিনি দোকান থেকে একটা (এক লিটার) আরসিকোলার বোতল নিয়ে এলেন।

আমি অন্য ঘরে গেলাম গ্লাস আনতে।

এসে দেখি ওনার হাতে একটা মগ। সেই মগে আরসিকোলা দিয়ে বললেন, এটা তুমি খাও আর আমার গ্লাস লাগবে না।

আরসিকোলা খেলাম। আলাপ করতে লাগলাম।

কেমন জানি লাগছে। বললাম, রভাই আমার ঘুম পাচ্ছে, আপনি বসে টিভি দেখুন, আমি একটু ঘুমাই আর যদি চলে যান তবে দরজাটা বন্ধ করে চলে যাবেন।

আমার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। বিভোর ঘুমে মগ্ন হলাম।

তার পরের ঘটনা শুনলে আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার ব্রা–র হুকগুলো খোলা। সালোয়ার, কামিজ কেমন জানি এলোমেলো। ভাবলাম ঘুমে কাতর ছিলাম। তাই বোধহয় এমন অবস্থা।

গোসল করতে গেলাম। জামা, কাপড়গুলো একেবারে খুলে ফেললাম। ব্রা–টা খুলতেই একটা জিনিস আমার চোখে পড়লো। আমার দুই স্তনে মারকারি একটি চিহ্ন অর্থাৎ আমার নামটা লেখা এবং ওই লেখাটা আমার শ্রদ্ধেয় বড়ভাই লিখেছেন।

কেমন জানি খটকা লাগলো। আরো নিচের দিকে খেয়াল করলাম অর্থাৎ নাভি বরাবর একটা কি যেন আকা, প্রথমে বুঝতে পারলাম না। পরে ভালো করে খেয়াল করে দেখি একটি পুরুষের লিঙ্গ আকা।

তবে কি রভাই আজ আমার সর্বনাশ করলেন? তাড়াতাড়ি গোসল করে রুমে গেলাম। গিয়ে দেখি বালিশের নিচে একটা চিঠি:

ম,

আমি জানি তোমার বলার কিছুই নেই। তবে বিশ্বাস করো ম, তোমার কোনো ক্ষতি করিনি। আমার কসম। শুধু তোমার ঠোটে আলতোভাবে আমার ঠোটগুলো রেখেছিলাম। ইচ্ছা করলে তোমার সর্বস্ব লুট করতে পারতাম। তোমার পাহাড়ের চূড়ায় আমার উত্তপ্ত হাত দিয়ে উত্তাল খেলায় মেতে উঠতাম। ইচ্ছা করলে তোমার গোপন অঙ্গে স্পর্শ করতে পারতাম। বিশ্বাস করো ম, কিছুই করিনি। তবে আজ যে সৌন্দর্য উপভোগ করেছি তা সারা জীবন আর উপভোগ করবো না। কেননা তোমাকে অনেকবার বলেছি, তোমাকে না পেলে আমি জীবনে বিয়ে করবো না। সুতরাং এই রকম দৃশ্য দেখা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আমি জানি ম, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে।

পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে তুমি চরিত্রহীন বলতে পারবে। কিন্তু আমাকে পারবে না। তার অনেক প্রমাণ তোমার কাছে আছে। তুমি তোমার বিবেককে প্রশ্ন করে দেখো। আর কখনো তোমার কাছে আসবো না।

ইতি

শ্রদ্ধেয় বড় ভাই র

চিঠিখানা পড়লাম এবং রভাই যা লিখেছেন তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলাম। কেননা ওনাকে আমি জানি, তিনটি বছর ধরে অনেক সুযোগ নিজ থেকে দিয়েছিলাম। কিন্তু কখনো তিনি নেননি।

অবিশ্বাস হলেও সত্যি! আমার শ্রদ্ধেয় বড়ভাই সেই সন্ধ্যায় এসে হাজির।

কি আর বলবো?

শুধু এইটুকু বললাম, র ভাই, ঘটনা কি সত্যি?

তিনি বললেন, তোমার কি মনে হয়?

আমি বিশ্বাস করি, আপনি যা লিখেছেন তা সত্যি। বিধাতা যেন আপনার মঙ্গল করেন। আমি সেই কামনাই করি।

ম, আজ আসি। বলে র ভাই চলে গেলেন।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

কারাবন্দীর ঈদ

– ওমর আলী

ঈদ সংখ্যা বছরে একবারই বের হয়। তাতে নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নেই। তাই মন খুলে লেখেন দেশ–বিদেশের পাঠক। কারারক্ষীদের ঈদ নিয়ে আমার একটি লেখা ছাপা হয়েছিল তিন বছর আগের ঈদে। তারপর অনেক পাঠক অনুরোধ করেছেন *কারাবন্দীর ঈদ* লেখার জন্য।

পেশাগত প্রয়োজনে জেলখানার জীবন সম্পর্কে জানার সুযোগ আমার হয়েছিল। ঈদ মানে আনন্দের দিন হলেও এখানে নেই কোনো আনন্দ, বরং সবাই থাকেন ভয়ে। কারা বিদ্রোহ কিংবা বন্দীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঈদের দিনেই বেশি ঘটে। তাই কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য কারারক্ষীদেরও ছুটি দেয়া হয় না। প্রতিটি কারগারের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বন্দীর সংখ্যা তিন চার গুণ বেশি। কারাগারে ওয়ার্ডের ভেতরে বন্দীদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কয়েদিদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে দায়িত্ব দেয়া হয়। জেলখানার ভাষায় এদের ম্যাট–রাইটার বলে।

টাকায় কি না হয় কথাটি জেলখানার জন্য সর্বাধিক কার্যকর। মদ, গাজা, হেরোইন, ফেনসিডিল সবই টাকায় মেলে। আমাদের নষ্ট রাজনীতির ভ্রষ্ট নেতা, গডফাদারদের কল্যাণে কারাগারে বসে মাদক দ্রব্য সেবনের পাশাপাশি নামকরা রেস্তরার খাবার ঘুম ভাঙার আগেই পেয়ে যান। ঈদের দিনেও এর ব্যতিক্রম হয় না। তবে এদিন পাতিনেতা, উপনেতা, চামচা সবার জন্যই থাকে বিশেষ বরাদ্দ। ঈদ উপলক্ষে নতুন পাঞ্জাবি–পাজামা, টুথপেস্ট, ব্রাশ, সাবান ছাড়াও কার্টন ভর্তি আসে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেট।

ধূমপান নিয়ন্ত্রণে সংসদে একটি আইন পাস হলেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যর্থতায় জেলখানার চার দেয়ালের ভেতরেও তা কার্যকর হয়নি। অবশ্য যেখানে অবাধে মাদক সেবন বৈধ সেখানে ধূমপানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার সাধ্য কার? দেশের কারগারগুলোতে বর্তমানে বন্দীর সংখ্যা দেড় লাখের উপরে। এদের বিনা পয়সায় খাবারের বন্দোবস্ত সরকারকেই করতে হয়। বন্দীর সংখ্যা অনুযায়ী চাল, ডাল, মাছ, মাংস ও মশলার বরাদ্দ করা হয়। দ্রব্যমূল্যের ওঠা–নামার ওপর ভিত্তি করে গড়ে প্রতি বন্দীর জন্য বিশ পচিশ টাকা প্রতিদিন ব্যয় হয়। ঈদ উপলক্ষে অতিরিক্ত দশ টাকার বরাদ্দ থাকে। দুই ঈদ ছাড়াও স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও ঈদে মিলাদুন্নবীতে বিশেষ খাবারের জন্য এ বরাদ্দ থাকে। তবে ধর্মীয় ও জাতীয় দিবসগুলোর মধ্যে শবেবরাত, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম উৎসব দুর্গা পূজাতে কোনো বিশেষ খাবারের বরাদ্দ নেই।

ঈদের দিন কারাগারের ওয়ার্ডগুলো ভোর থেকেই খুলে দেয়া হয়। তারপর ভেতরে আয়োজন করা হয় ঈদের জামায়াত। ঈদের নামাজের জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবুও বেশির ভাগ বন্দীই নামাজে শরিক হন। নামাজ শেষে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করেন। ঈদের বিশেষ খাবার হিসেবে সকালে সেমাই ও মুড়ি দেয়া হয়। দুপুরে গোশত–পোলাও, বিকেলে ভাত–মাছ। কারাগারে রাতে কোনো খাবার দেয়া হয় না। সূর্যাস্তের আগেই লকআপের বিধান। তাই রাতের খাবার বিকেলেই দিয়ে দেয়া হয়। ঈদের দিনসহ উল্লিখিত বিশেষ দিনগুলোতে মাত্র এক ছটাক মাংস দেয়া হয়। বন্দীদের জন্য প্রতিদিন আধা ছটাক মাছ অথবা মাংস দেয়ার বিধান। রংপুরে তা প্রতিদিন দেয়া হলেও অন্যান্য কারাগারে একদিন পর পর এক ছটাক করে দেয়া হয়।

বন্দীদের খাবারের জন্য বরাদ্দ অত্যন্ত কম হলেও কর্তাদের দুর্নীতির জন্য সেটুকুও বন্দীরা পান না। জেলখানায় খাবারের মান বরাবরই নিচু। বন্দীদের জন্য যে গরুগুলো আনা হয় সেগুলো এতেই দুর্বল যে, তারা পায়ে হেটে আসতে পারে না। জেলখানায় খাবার সরবরাহের সময় দেখা গেছে গরুগুলোকে আনা হয় ঠেলাগাড়িতে করে। তরকারিসহ অন্য খাবারের অবস্থা আরো শোচনীয়। রোগাক্রান্ত অথবা অসুস্থ গরুর মাংস খেয়ে

কারাবন্দীরা কিভাবে সুস্থ থাকেন সেটাই বিস্ময়ের বিষয়। ভেজাল বিরোধী অভিযান কি জেলখানাতেও চালানো যায় না?

কারাবন্দীদের জন্য বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই। পানি খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত গ্যালন, মিনারাল ওয়াটারের বোতল, থালা-বাটি দিয়ে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সাধারণ বন্দীরা গান বাজনা করে অলস সময় কাটিয়ে থাকে। বিত্তবান বন্দীরা অবশ্য আমোদ-প্রমোদ সবই করতে পারেন। এরা অর্থের বিনিময়ে দরিদ্র বন্দীদের রক্ষিতা (জেলখানার ভাষায় ফালতু) হিসেবে রাখেন। রক্ষিতারা তাদের মনিবদের জামা-কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে জৈবিক চাহিদাও মেটান। বিত্তশালি বন্দী ও বিভিন্ন দলের ক্যাডারদের লালসার শিকার হন কিশোর বন্দীরা। কর্মকর্তাদের মাধ্যমে খাবার বন্ধ করার হুমকি দিয়ে অনেকে তাদের বলাৎকারে বাধ্য করেন।

এছাড়া মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে মহিলা ওয়ার্ডের বন্দীদেরও সরবরাহ করা হয়। অনেক সময় বাইরে থেকেও পতিতা সরবরাহ করা হয়। কারাগারের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফলে বাইরের পৃথিবী পর্যন্ত এ খবর পৌঁছে না। কারারক্ষীরা পর্যন্ত টের পায় না চার দেয়ালের ভেতর কখন কি ঘটে। যারা ভেতরে ঢোকে তারা সবাই আসামি। যারা জামিন নিয়ে ভেতর থেকে বের হয় তারাও আসামি। জেলখানার আসামিদের নিয়ে যেন সেখানে চলছে জমজমাট ব্যবসা।

ঈদের দিনে বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাদের আত্মীয়রা দূর-দূরান্ত থেকে আসেন। বাড়ি থেকে আসার সময় নিয়ে আসেন নানান রকম খাবার। ভেতরে খাবার দিতে হলে যেমনি টাকা দিতে হয় তেমনি সাক্ষাতের জন্যেও নগদ নারায়ণ অবধারিত। প্রতি বছর ঈদ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমার আওতায় ঈদের সময় দুই একজনের মুক্তি মেলে। রাজনৈতিক বন্দীরাও কেউ কেউ মুক্তি পান।

অর্থাভাবে যারা মামলা পরিচালনা করতে পারেন না তাদের লাল দেয়ালের ভেতরেই পড়ে থাকতে হয় বছরের পর বছর। পুলিশের বিশেষ ক্ষমতা আইনের জালে (৫৪ ধারা) প্রতি বছর কতো নিরীহ মানুষকে যে লৌহ কপাটে আটকে রাখা হয় কে জানে! শুধু ঈদের সময় পুলিশের চাদাবাজিতে পড়েই বহু নিরপরাধ মানুষকে জেলে ঈদ করতে হয়। জেলখানার জীবন বড়ই মানবেতর জীবন। সেখানে ঈদের দিন মানে নিদারুণ কষ্টের দিন।

আলমনগর, রংপুর থেকে

pairaho@yahoo.com

শিক্ষা

- ম. আলম

উফ! ক্ষিধের যন্ত্রণা যে কি! কতোক্ষণ শুধু পানি খেয়ে থাকা যায়। বালিশ চাপা দিয়ে রাখলেও পেট ব্যথা করে। টিপুটা কখন যে বাড়ি থেকে আসবে? ও থাকলে দশ বিশ টাকা লোন নেয়া যেতো। বাদল শালা তো হাড় কিপটে, একটা টোস্ট বিস্কিটও খেতে দেয় না।

মায়ের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল আমার। বাবা না হয় আমাদের এতিম করে চলে গেছেন, কি দরকার ছিল মায়ের এতো কষ্ট করার। একটা এতিমখানায় দিয়ে দিলে তো হতো। শুনলাম ছোট বোনটিকে গ্রামে কারা ডিসটার্ব করছে।

এবার অসহ্য খারাপ লাগছে আমার দুই ছাত্রীর ওপর। দুই বোনই বজ্জাতের হাড্ডি। পড়াতে গেলেই দুজনে নানা টিজ করে বলতো, স্যার, আপনাকে দেখতে অমুক নায়কের মতো লাগে। আপনি স্যার, পাজামা, পাঞ্জাবি পরতে পারেন না? ধমক দিলেও ভয় পেতো না। এক প্যান্ট শার্ট দিয়ে যে বছর চালিয়ে দেয়, তার আবার পাজামা!

হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে দুজনেই পড়ার টেবিলটা আমার বুকের ওপর উঠিয়ে দিয়ে অন্ধকারে ভো দৌড়। পরে চার্জলাইট এনে ক্ষমা চাওয়ার পরেও ওই বাড়িমুখো আর হলাম না। মাস শেষের টাকাটাও আনতে গেলাম না।

দরজা ধাক্কাচ্ছে কে আবার, এ কি টিপু ব্যাগ নিয়ে হাজির।

কি রে ক্লাসে গেলি? খেয়েছিস? মা কিছু পিঠা বানিয়ে দিয়েছেন। ইচ্ছা করলে নিয়ে খা।

পাগলের মতো আমার পিঠা খাওয়া দেখে টিপু বললো, তুই বরং আরেকটি টিউশনি ম্যানেজ করে নে।

না, টিউশনি আর করবো না।

চলবে কি করে, হাওয়া খেয়ে?

আমাকে কিছু টাকা দিবি?

তা না হয় দিলাম। দিলে?

ইউনিভার্সিটি হস্টেল থেকে সোজা চলে এলাম আমাদের ইউনিয়নের প্রখ্যাত ইমপোর্টার–এর দিলকুশা অফিসে। বিনীত হয়ে ভদ্রলোকটার কাছে পার্টটাইম জব চাইলাম।

অনেকক্ষণ আলাপ শেষে লোকটা আমাকে বললেন, তুমি বরং আমার মেয়েটাকে একটু দেখো। আগামী বছরে ইন্টারমিডিয়েট দেবে। টাকার চিন্তা করো না, আমি চাচ্ছি তোমার লেখাপড়ার যাতে ক্ষতি না হয়।

আবার টিউশনি? আবারও ছাত্রী? নিরুপায় আমি।

আমার ছাত্রীর নাম অদ্ভুত, আনকমন!

টুবনী।

প্রথম দিনেই শর্ট কামিজ পরে ওড়না ছাড়াই পড়তে বসলো সে। ভাবলাম বড়লোকের মেয়েরা হয়তো এভাবেই অভ্যস্ত। এক ঘণ্টা পরে খাবার এলো হাবেরি পরটা আর বিফ সিসিলি। আমার দাদাও ওই খাবারের নাম শুনেছেন বলে মনে হয় না। পরে এলো পিস করা আপেলের সঙ্গে ঘন দুধের চা।

আসার সময় টুবনী একটা খাম দিয়ে বললো, আপনার জন্য আব্বা দিয়ে গেছেন স্যার।

কড়কড়ে ছয়টি পাচশ টাকার নোট। চোখে হাজার তারা যেন দেখলাম। নাইট পোস্ট অফিসে ঢুকে মানি অর্ডার ফর্ম নিয়ে নিচে লিখলাম, মা, তিনটা টিউশনি করছি বর্তমানে। এক সঙ্গে তিন হাজার পেয়ে তোমাদের জন্য দুই হাজার পাঠালাম।

কয়দিন পরে ছোট বোনটি চিঠি লিখে জানালো, ভাইয়া, তোর টাকা পেয়ে মা প্রাণভরে তোর জন্য দোয়া করেছেন। জানিস, এ কয়দিন আমরা শুধু জাউ রান্না করে খেয়েছি।

বুক ঠেলে বেরিয়ে আসা প্রচণ্ড কান্নাকে দমাতে পারলাম না। কতোক্ষণ কেদেছি জানি না।

আমাকে থামাতে না পেরে টিপু, বাদল বললো, কেদে নে শালা যতোক্ষণ ইচ্ছা, আমরা ক্লাসে গেলাম।

নিজেকে একটা অপদার্থ ছাড়া কিছুই ভাবতে পারলাম না।

এদিকে টুবনী একদিন বলে বসলো, স্যার, আপনার তো অনেক মেয়ে বন্ধু আছে, তাই না?

প্রসঙ্গ চেঞ্জ করে বললাম, তুমি নামাজ পড়ো?

পরদিন থেকে টুবনীর পোশাকের পরিবর্তন। তার আগ্রহে মাত্র এক মাসের মাথায় টুবনীকে নামাজে দাড় করালাম। এক সন্ধ্যায় টুবনীকে নামাজ পড়তে দেখে তার আব্বা আমাকে বললেন, আমি খুব খুশি। থ্যাংক ইউ। আশা করছি তুমি একদিন মানুষ গড়ার কারিগর হবে।

ভাবলাম, নামাজ জানা সত্ত্বেও যে নিয়মিত জুমার নামাজে যায় না সে হবে কারিগর!

কাল টুবনীর জন্মদিন। তার বাবা মা বলার পর টুবনী চুলের একটা গোছা আঙুলে প্যাচাতে থেকে (মুদ্রাদোষ) আমাকে বললো, স্যার, কাল আমার অনেক বান্ধবীরা আসবে, প্লিজ, বি ওয়েল ড্রেসড...

বললাম, দেখো, আমার আর কোনো ভালো জামা নেই।

অনেকটা টানাটানি করেই টুবনী আমাকে গুলশান মার্কেটে নিয়ে গেল। এসি গাড়িতে জীবনে ওই প্রথম।

পরদিন তার কিনে দেয়া দামি পাজামা পাঞ্জাবি পরেই হাজির হলাম। কেক কাটার আগ মুহূর্তে বাবা মাকে সালাম করার পর টুবনী আমারও পা ছুয়ে বললো, স্যার, আপনিও আমাকে দোয়া করবেন।

আমার জন্য ছিল সেই এক স্মরণীয় ঘটনা।

এবার সে তার এক ঝাক বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল আমাকে।

আর যায় কোথায়, মেয়েরা আমাকে নিয়ে নানা দুষ্টুমি শুরু করলো। একজন তো টুবনীকে বলেই বসলো, ও রকম মিষ্টি স্যার পেলে আমি লেখাপড়াই ছেড়ে দিতাম।

টুবনী আমার হাতে একটা ক্যামেরা ধরিয়ে দিয়ে বললো, স্যার, এটা ফুল অটো ক্যামেরা, আপনার ইচ্ছা মতো ছবি ওঠাতে থাকেন।

ক্যামেরা দূর থেকে দেখলেও জীবনে ছুয়ে দেখিনি আর সেই আমি ওঠাবো ছবি! নার্ভাস কাকে বলে। হাত কেপে এক পর্যায়ে ক্যামেরাটাই নিচে পড়ে গেল।

সবার হাসাহাসি দেখে দ্রুত টুবনী এসে বললো, স্যার, ক্যামেরাটা নিচে ফেলে দিয়ে এভাবে হাটু নাড়াচ্ছেন যে?

মনে মনে বললাম, হাটু নাড়াচ্ছি না, অটো নড়ছে।

আমার এই অবস্থা দেখে টুবনী বললো, প্লিজ, ইজি স্যার।

বাথরুমে ঢুকে দেখি কর্ম সারা। পাজামার একপাশ বিশেষ জলে ভিজে একাকার।

আসার সময় এক সঙ্গে বাধা তিনটা প্যাকেট দিয়ে টুবনী বললো, আপনার রুমমেটদের জন্য কিছু খাবার দিলাম।

ওমা, প্রথম প্যাকেটে সেই ক্যামেরাসহ একটা চিঠি।

স্যার।

আপনাকে আমার ভালো লাগে বলেই আপনার সব কথা আমি রাখি। আজ থেকে আপনাকে আমার অন্য রকম ভালো লাগছে ... আপনার? জানেন তো গিফটের কোনো কিছু ফেরত দিতে নেই। বললো টুবনী।

কয়েকদিন পরে ওই চিঠির প্রসঙ্গ ওঠালে তাকে বললাম, ভালো লাগে তো ভালো কথা। গিফটের জন্য ধন্যবাদ।

তিন মাস পরেই চমৎকার রেজাল্ট করলো সে।

কিন্তু একি!

হঠাৎ করেই তার বাবা মায়ের সখ হলো টুবনীকে বিয়ে দেবেন। ভালো ছেলে হাতছাড়া করা যাবে না।

যে কথা সে কাজ। মহা ধুমধামে বিয়ে এবং এক মাসের মাথায় স্বামীর সঙ্গে টুবনী উড়াল দিল ইটালিতে।

পরীক্ষা শেষে তার বাবার একক প্রচেষ্টায় একটা নামকরা ব্যাংকে জয়েন করলাম। মোটা অংকের বেতন। আমার হাতে এখন দামি মোবাইল। মা বোনও এখন আমার কাছে। টিপু ভালো ব্যবসা করছে।

হুট করে টিপুর বাবা মা এসে বোনটিকে আংটি পরিয়ে গেলেন।

দুজনে যে এতো দিন ... বুঝতেই পারিনি। যাকে কথায় কথায় শালা বলতাম সে উল্টো মোবাইলে বড় শালা বলে টৃট করে আমাকে।

মাছে ভাতে আমার দিন যাচ্ছে মহা আনন্দে। শস্তা বলে তেলাপিয়া মাছটা বেশি কিনি।

মা আমার জন্য মেয়ে খুজে বেড়াচ্ছেন। স্বপ্নে বিভোর আমি।

আচমকা টুবনীর বাবা মা ফোনে ডেকে পাঠালেন আমাকে।

বাড়িতে পিনপতন নীরবতা। দুজনে আমার দুই পাশে বসে বললেন, আমরা বড্ড ভুল করে ফেলেছি বাবা। না বুঝে একটা বাজে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে টুবনীর জীবনটাই শেষ করে দিলাম। আজই ওই ছেলেকে ডিভোর্স পাঠালো টুবনী।

রুমে ঢুকতেই ক্লান্ত বিধ্বস্ত টুবনী হু হু কেদে বললো, স্যার, আপনার কথায় আমি নামাজ রোজা করেছি। কাউকে কোনোদিন কষ্ট দিইনি ... এতো কিছুর পরেও বাবা মা আমাকে তুলে দিলেন একটা লম্পট ছেলের হাতে। স্যার, আপনি কি অভিশাপ দিয়েছেন আমাকে? দেবেন না কেন, ইঞ্জিনিয়ার ছেলের কথা শুনে আমিই তো আপনাকে ল্যাং মেরে চলে গেলাম। কিন্তু আপনাকে বুঝতে চেয়েছি। ভালো লাগার কথা বলেছি।

স্বীকার করলাম তার যোগ্যতা অর্জনে আমার ব্যর্থতার কথা।

তার বাবা মায়ের অনুরোধে আজ এখানে, কাল ওখানে টুবনীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ইদানীং কিছুটা ইজি হয়ে এসেছে সে। মাঝে মধ্যে হাসে, ফান করে।

উত্তরায় রেড ফোর্ট রেস্টুরেন্টে বসে টুবনী আমাকে জানালো, আপনার মতো হ্যান্ডসাম, অবিবাহিত, ব্যাংক অফিসারের প্রয়োজন টুসটুসে পাকা মিষ্টি আমের। চেটেচুটে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলা আটির পেছনে ঘুরপাক খাচ্ছেন কেন?

তোমার বাবা মায়ের অনুরোধ পালন করছি মাত্র।

ওনারা যদি আমাকে বিয়ে করতে বলেন, রাজি হবেন আপনি?

অসহায় আমি।

তার মানে?

ওনারা আমাকে ফুটপাথ থেকে টেনে এনে আলো দেখিয়েছেন বলে পনেরো তলায় অভিজাত রেস্টুরেন্টে বসে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছি।

তাহলে কি ভাববো আপনিও আমাকে একদিন ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলবেন?

সব পুরুষ তো এক রকম নয়।

পুরুষ চিনতে বাকি নেই আমার। আপনি তো আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, কাউকে ঠকানো, প্রতারণা করা অন্যায়।

আমি তো জানি, তুমি নির্দোষ, রুচিশীলা একটা ভদ্রমেয়ে।

আপনি আসলে একটা স্বার্থপর, লোভী। বিয়ে করে আমাকে বেড পার্টনার করতে চান তো? তা হবে কেন, চান তো এখনি চলুন কোনো ভালো হোটেলে, আমি রাজি। কিন্তু বিয়ে নামের দুর্বিষহ যন্ত্রণার ফাদে পা দিতে আমি টুবনী রাজি নই।

আগামীতে আমার কি হবে, হতে যাচ্ছে!

আমি আর ভাবতে পারছি না।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

অবৈধ বাসনা

– মিলি

উঠতি বয়সের প্রারম্ভে একজনকে আমার খুব ভালো লাগতো। সে ছিল কাঙ্ক্ষিত। আজ আমার সমস্ত জীবনীশক্তি দিয়ে তার কথা লিখবো। লিখবো আমার জীবনের কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কথা।

১৯৮৮ সালের শুরুর দিকে সে আমার শিক্ষক হয়ে আসে। অংক ছাড়া মেধা আমার কখনোই দুর্বল ছিল না। এতো মেধার পরও এসএসসি–তে কৃতকর্মের মুখ দেখতে আমার দুই বছর লেগে যায়।

শুকনো শরীর, মাথা ভর্তি ঝাকড়া চুল আর মিষ্টি চেহারা নিয়ে প্রথম যখন তার কাছে পড়তে বসি তখন নিজেকে মনে হতো আমি বাকিংহাম প্যালেসের ডায়ানা, যেন যুবরাজ চার্লস শুধু আমারি জন্য। কি যে ভালো লাগতো! কি যে ভালোবাসতে ইচ্ছা করতো, এখন সে কথা ভাবলে নিজের মাঝে সেই অনুভূতি ফিরে পাই! আর কষ্ট পাই এই ভেবে, এতো ভালোবাসা মনে পুষে রেখেও তাকে বলতে পারিনি, বোঝাতেও পারিনি। তাকে নিয়ে প্রতিদিন নতুন স্বপ্নের জাল বুনতাম, সাজাতাম সুখের সংসার, বেড়াতাম অজানা জায়গায়। যখন স্বপ্ন ভেঙে যেতো তখন মনে হতো আমার ছোট হৃদয়টা ঠিকরে বেরিয়ে গেল।

এ পর্যন্ত যা লিখলাম তার সবটুকুই ছিল আমার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অক্ষমতা হলো সেই পুষে রাখা ভালোবাসা তাকে বোঝাতে না পারা যে অক্ষমতার অনুশোচনায় আজও আমি দগ্ধ হচ্ছি।

মাস কয়েক পড়ানোর পরই শুনতে পেলাম সে চাকরি নিয়ে চলে যাবে।

বর্ষার অঝোর ধারার মতো আমার দুই চোখ ভাসিয়ে দিয়ে গেল। সেদিন এই কান্নার জন্য অগ্রজ থেকে অনুজ পর্যন্ত সবার কথা শুনেছি। সবাই প্রশ্ন ছুড়েছে, তার জন্য এতো কান্না কেন? পাঠক বিশ্বাস করুন, এতো ভালোবাসা আমার জীবনে আমি আর কখনো উপলব্ধি করিনি।

এরপর রাত যায়, দিন আসে। আমি একদম ভেঙে পড়ি। দেখতে দেখতে ক্লাস নাইনে উঠি। এরই মাঝে জানতে পেলাম কেউ একজন আমার ভাইয়ের বন্ধু অনেক কিছুর ঊর্ধে আমাকে ভালোবাসে। বলতে পারেন সে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, মাস্টার্স পাস, ভদ্র, নম্র, ভালো ঘরের ছেলে। সর্বোপরি ছোটখাটো একটা সরকারি চাকরিজীবী।

তার ভদ্রতা আমাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করতো। তার সরলতা, সে কেবল মেঘমুক্ত আকাশের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। পাগলের মতো ভালোবাসতো আমাকে। তার ভালোবাসা দেখলে আমার হিংসা হতো। ঠিক যেন এই ভালোবাসাটাই চেয়েছিলাম। আরেকজনের কাছ থেকে।

অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে একদিন তাকে মন দিলাম। সত্যিই তার ভালোবাসা হিংসা করার মতো। আমাকে ভাবতে শেখালো নতুন করে। চলতে শেখালো নতুন পথে। স্বপ্ন দেখালো এক নতুন দিনের।

এতো কিছুর পরও মনের কোথায় যেন একটা কষ্ট অনুভব করতাম। বড়দের মুখে একটা কথা শুনতাম। প্রেম কি আর বুড়ো হয়। দেখলেই মনে হয় হওয়ারই কথা। কারণ তার বাড়ি আর আমার বাড়ি একশ গজ দূরত্বের মধ্যে।

যাক, ভালোবাসার নতুন ভুবনে নতুন করেই দ্বিতীয়কে ভালোবাসতে শিখলাম। দীর্ঘ পাচ বছর সম্পর্কের পর ফ্যামিলিগত নানান টানাপোড়েনে এক সময় পালিয়ে দুজন বিয়ে করি।

বিয়েটা হয় ১৯৯৪-এর জানুয়ারির ২২ তারিখে আমার বোনের বাসায়। বিয়ের পর আমি থেকে যাই সেখানেই আর স্বামী বেচারি চলে যায় তার বাড়িতে। তখন প্রচণ্ড শীতকাল। দুই একদিন পর পর সে ফোন করে বলতো, টাকা আর বৌ কারো কাছে ফেলে রাখতে নেই। এই শীতে একটা বৌ যে কতো প্রয়োজন তা কি বোঝো?

লজ্জায় চুপ করে থাকতাম।

এর কিছুদিন পরই রোজার ঈদ। ঈদের দিন আমার বোন বললেন, আজ তোরা এক সঙ্গে থাকবি।

আমার মাথায় যেন বাজ পড়ে গেল। স্বামী বেচারী হ্যা না করেও থেকে গেল।

আমার বোন বাবার বাড়ি চলে গেলেন। সারা ফ্ল্যাটে আমি আর সে।

এই প্রচণ্ড শীতের মাঝেও ঘেমে একাকার হয়ে গেলাম। একটা মেয়ে যতোটুকু পেলে সুখী হয়, মনে হলো তারচেয়েও বেশি পেলাম।

সেই প্রথম রাতের প্রথম ছোয়ায় সে প্রশ্ন করলো, আমিই কি তোমার জীবনের প্রথম প্রেম?

ঘর্মাক্ত শরীর যেন আমার হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। প্রথমবারের মতো জীবন থেকে থমকে দাড়ালাম। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম সুখময় বাসর রাতের অনুভূতি থেকে। যে আমাকে ভালোবাসতে শেখালো তাকে তো ভোলার নয়। অনেক ভেবে ঈদের দিনটিকে মাটি করতে চাইনি। যাকে পাবো না তাকে নিয়ে আর ভাবতে চাই না। সে আমার অস্তিত্বের মাঝে একাকার হয়ে থাকে। যখন মনে পড়বে তখন তাকে মেলে ধরবো আমার অন্তর আত্মার মাঝে।

তারপর সেদিন রোজার ঈদ, কোরবানির ঈদ এক সঙ্গে আমার উপর দিয়ে বয়ে গেল। আজও প্রতি ঈদে আমার স্বামী আমাকে ঠিক ওই ভাবেই চায়। পাঠক, এবার আসি আমার বাস্তব জীবনে।

সংসার জীবনে আমি সত্যিই সুখী। দীর্ঘ প্রায় এক যুগের সংসারে আমার দশ বছরের এক মাত্র সন্তান নিয়ে নিজের গড়া রাজ্যে আমিই রাজা। যে ভালোবাসা একদিন জীবনের প্রথম পুরুষ থেকে পেতে চেয়েছিলাম সেই ভালোবাসাই স্রষ্টা আমাকে আরেকজনের মধ্য দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। সুখ আমার অজানাই থেকে যেতো যদি এমন একটা মানুষের কাছে না আসতাম। আমার লেখার শুরুতে বলেছিলাম, আমার অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কথা লিখবো।

দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় পেরিয়ে আমার সেই শিক্ষক মহাশয় প্রবাসী জীবনকে বিসর্জন দিয়ে সম্প্রতি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছে।

আটাশ বছর বয়সে আমি দুবার আমার জীবন থেকে কিছুক্ষণের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। প্রথমবার বাসরঘরের প্রথম ছোয়ায় স্বামীর প্রশ্নে।

আর আজ দ্বিতীয়বারের মতো থমকে দাড়ালাম যখন সে এতো বছর পর আমার সামনে দাড়ালো, জিজ্ঞাসা করলো, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগতো। কিন্তু বলতে পারিনি, আজও তোমাকে মনে পড়ে। প্রশ্ন ছুড়লো, তুমি কি একটুও বোঝোনি?

মনে হলো স্রষ্টার কাছে থাকা সমস্ত বজ্রগুলো আমার মাথায় আঘাত হানলো। নিজেকে একদম স্বাভাবিক রেখে অস্বীকার করলাম। সত্যিই তো এক মুহূর্তের জন্যও কখনো বুঝতে পারিনি। যদি বুঝতাম তাহলে এতো দিনে হিমালয় পাড়ি দিতাম। সেদিনের পর থেকে একটি দিনকে মনে হতে লাগলো একটি বছর সমান।

কি প্রয়োজনে যেন তার কর্মস্থলে একদিন গেলাম। বললাম, আমার বাসায় আসেন না কেন?

উত্তরে বললো, ইচ্ছা করেই যাই না। তোমাকে দেখলে খারাপ লাগে।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনি। কিছু লেখার মাঝে প্রকাশ করে জানালাম আমারও যে একদিন তাকেই চাওয়ার ছিল। সেদিনের পর থেকে সমস্ত আফসোস এসে জড়ো হলো আমার মাঝে।

এক পা, দুই পা করে জমে থাকা ভালোবাসার সঙ্গে নতুন করে মায়া যোগ করলাম। যা হওয়ার নয় তাই নিয়ে ভাবতে লাগলাম।

পরকীয়াকে সব সময় ঘৃণা করতাম। কারণ পরকীয়া নীরব ঘাতকের মতো। সেই ঘাতকই একদিন আমার মাঝে বাসা বাধলো। সে অনেকবার বলেছে তার সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যেতে। কাফেতে বসে এক কাপ চা খেতে। কিন্তু সাহস করিনি।

আমার নিজ ঘরেই তার সঙ্গে কথা হয়। কথা হয় আমার নাড়ি-নক্ষত্রের সঙ্গে। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করি। প্রশ্ন করি স্রষ্টাকে, কি হতো যদি তার ঘরের ঘরণি হতাম। কি হতো যদি তার সন্তানের মা হতাম? আমি প্রচণ্ড সুখী হতে চেয়েছিলাম, তাকে বাদ দিয়ে নয়।

আমার ভুবন ভোলানো হাসি মাখা সন্তান আর অসহায় স্বামীর দিকে তাকালে সব ভুলে যাই, আবার তার প্রতিচ্ছবি আমার মাঝে দেখলে নিরূপায় হয়ে যাই। দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা হয়ে নীরবে জ্বলে যাচ্ছি। পৃথিবীর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, স্বামী সন্তানের মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করি নতুন গ্রহ থেকে আসা কোনো প্রাণীর

মতো – যে কি না পৃথিবীর নিয়ম–কানুন কিছুই বুঝতে চায় না। সবাই বলে আমি খুব হাসতে পারি। কিন্তু ইদানীং আমার দুঃখ বিলাসী মন কোনো বৈরী পরিবেশে স্থির হতে চায় না।

পাঠক বুঝতে পেরেছেন, স্রষ্টা আমার ওপর কতোটুকু নির্দয় আচরণ করলো! সারা জীবন না হয় দূর থেকে আমিই তাকে ভালোবেসে যেতাম, কেন যে জানলাম সেও আমাকে চাইতো।

এতো কিছু পরও আমার খুব ইচ্ছা করে তার সন্তানের মা হতে। তাকে তো জীবনে পাবোই না। কিন্তু তার আদলের একজনের জন্যও কি আমি দিতে পারবো না? যাকে সারা জীবন আমার বুকের মাঝে রেখে বড় করবো। আমি ছাড়া, শুধু আমি ছাড়া, শুধুই আমি ছাড়া পৃথিবীর কেউ জানবে না। স্রষ্টা নিশ্চয়ই এটুকু দিতে আমাকে কার্পণ্য করবে না।

ও খোদা, তুমি আমাকে সাহস দাও।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

নিরামিষ ঈদ

– আলমগীর চৌধুরী

ঈদ মানেই আনন্দ। ছোটবেলা থেকেই দেশে আমরা এ আনন্দ শেয়ার করে এসেছি। এখনো দেশবাসী এ আনন্দ থেকে বঞ্চিত নয়, বঞ্চিত শুধু প্রবাসীরা, বিশেষ করে যারা মধ্যপ্রাচ্যে আছেন। সাধারণত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরাই এখানে অবস্থান করেন সঙ্গত কারণে।

এমনিতেই এখানে ঈদের আমেজ বলতে কিছুই নেই, তার উপর আমরা বাংলাদেশিরাই হয়তো প্রবাসের ঈদগুলোকে আরো নিরানন্দময় করে তুলি।

এখানে ঈদের সময় চার থেকে সাত দিন ছুটি থাকে। ইনডিয়া, পাকিস্তানের লোকেরা এ সময়টা পার করে দেয় কৃকেট খেলে। কখনো খেলে নিজেদের মধ্যে, কখনো বা একে অপরের বিপক্ষে। ফিলিপিন্স–এর লোকেরা সময়টা এনজয় করে বাস্কেটবল ও টেনিস খেলে।

অনেক ফিলিপিনো আবার দল বেধে কোথাও যায় মাছ শিকারে। এমনকি আমাদের চেয়ে গরিব নেপালিরাও সময়টা এনজয় করে তাদের প্রিয় ভলিবল খেলে।

আর বাংলাদেশিরা? এ মহান দেশের মহান সন্তানরা ছুটির সিংহ ভাগই কাটিয়ে দেন ঘুমিয়ে। অনেকে আবার সারা রাত তাশ খেলে, গল্প করে এবং ঈদের নামাজ না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে। কিছু কিছু বাংলাদেশি নিজ নিজ দলের রাজনীতি করে এমন লোকদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়া দাওয়ার জন্য। প্রসঙ্গত বলা উচিত, অন্য কোনো দেশের লোকেরা প্রবাসে রাজনীতি করে না।

বিচিত্র স্বভাবের বাংলাদেশিরা কবে ও কিভাবে সভ্য হবে এবং প্রবাসে ঈদকে আনন্দময় করে তুলবে সে প্রশ্নের উত্তর খুজে পাই না।

সউদি আরব থেকে

alamgir67@yahoo.com

গডফাদার

– মুজিব

২০০০ সাল। সমগ্র পাবনা জুড়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি ও জনযুদ্ধের (লাল পতাকা) বিচরণ। পাবনা জেলার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো, বিশেষ করে সিরাজগঞ্জ ও নাটোরেও একই অবস্থা। স্বাধীনপূর্ব নকশাল পার্টির মাধ্যমে সৃষ্ট এসব পার্টিগুলো *সর্বহারা* নামে মানুষের সর্বস্ব হরণ করার দীক্ষা নিয়ে মাঠে নেমেছে। এরা একদিকে যেমন কিছু মানুষের রাতের ঘুম হারাম করেছে অন্যদিকে এদের ওপর ভর করে কিছু মানুষ পরম সুখে রাতের ঘুম উপভোগ করছে। এমন দ্বৈতনীতির দোলাচলে দুলছে বাংলাদেশ।

কিছু অতি উৎসাহী তরুণ হয় বেকারত্ব, না হয় প্রতিহিংসা অথবা সাম্যবাদিতার ছদ্ম বরণে এমন কর্মে লিপ্ত হয়েছে। এখন তারা জমিজমা থেকে শুরু করে অবৈধভাবে সন্তান ধারণের মতো বিষয়গুলোর মীংমাসা করছে নিজস্ব আদালতে, নিজস্ব আইনে। এতে করে তারা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে টুপাইস ইনকামও করে নিচ্ছে।

যাই হোক, দুর্বৃত্তায়ন যখন সচিবালয় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে আছে তখন এসব অল্প শিক্ষিত, ক্ষেত্র বিশেষে অশিক্ষিত দুর্বৃত্তদের ফিরিস্তি গেয়ে লাভ কি! বরং ২০০০ সালেই ফিরে যাই।

তখন প্রথম চাকরি ছেড়ে দ্বিতীয় চাকরিতে জয়েন করেছি। আমার পোস্টিং হয় নাটোরে। মার্কেটিং জব। তাই মার্কেট টু মার্কেট টুর করতে হয় প্রতিদিন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে কিছু দিন পর পরিচয় হয় জনযুদ্ধের (লাল পতাকা) এক নেতার সঙ্গে (সম্প্রতি ক্রসফায়ারে নিহত)। তার কাছে জানতে পারি তাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে। লোকটির কথাগুলো আমার ভালো লাগে। সমাজের অবহেলিত বঞ্চিত মানুষের জন্য উৎসর্গ করা জীবনের কাহিনী আমাকে আপ্লুত করে। তাদের প্রতি ভালোবাসা জাগায়।

কিন্তু সমস্ত ভালোবাসার মৃত্যু ঘটে যখন নিজের জীবনে ঘটে যায় এর বিরূপ ক্রিয়া। ওই বছর রোজার ঈদ উৎযাপন করার জন্য বাড়ি যাচ্ছিলাম। সঙ্গে ছিলেন গ্রামের মাদ্রাসার একজন শিক্ষক।

রাত নয়টার দিকে আমরা থানা সদরে পৌছালাম। সেখান থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে আমাদের গ্রাম। তিন কিলোমিটার যেতে হয় ভ্যান (বিকল্প রিকশা) গাড়িতে, তারপর হেটে। সঙ্গের মাস্টার আমাকে এলাকার অবস্থার কথা বললেন। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া সন্ধ্যার পর কেউ বাইরে বের হয় না। তারপর আবার ঈদের আগের রাত। তিনি আমাকে বার বার নিষেধ করলেন।

কিন্তু নিজের জন্মস্থানের একটা আলাদা সাহস আমাকে তাড়িত করলো। বললাম কোনো সমস্যা হবে না, এলাকার সবাই আমাকে চেনে।

দুজন রওনা হলাম। অনেক কষ্টে একটি ভ্যান ভাড়া করলাম। কিন্তু দুই কিলোমিটার আসার পর ভ্যানের চাকা পাংচার হয়ে গেল। ফলে ভ্যান ছেড়ে হাটা শুরু করলাম।

কিছুক্ষণ হাটার পর সামনে একটি ভাঙা বৃজ পড়ে। ভয়টা সেখানেই বেশি। কারণ এর আগে অনেক ঘটনাই সেখানে ঘটেছে। থানা প্রশাসনও তা জানে। কোনো প্রকার পুলিশি টহলের ব্যবস্থা করা হয়নি।

আমাদের দুজনের মুখেই কোনো কথা নেই। মনে মনে শুধু আল্লাহকে স্মরণ করছি আর দোয়া–দরুদ আয়তুল কুরসি পাঠ করছি।

বৃজের কাছাকাছি যেতেই বুঝতে পারলাম দুজন লোক অপর প্রান্ত থেকে আমাদের দিকে আসছে। একটু সাহস পেলাম। কিন্তু বিধি বাম। তারাই সর্বহারা নামের সর্বস্ব হরণকারী। তাদের পেছন থেকে আরো দশ বারোজন যোগ হয়ে নিজেদের পরিচয় দিল।

তাদের সশস্ত্র অবস্থা আমাকে আরো বেশি ভীত করলো। ভীত বিহ্বল চিত্তে শুধু আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম। আমার সঙ্গের লোকটি হাউ মাউ করে কাদতে শুরু করলেন, একই সঙ্গে বিভিন্নভাবে কাকুতি–মিনতি করতে লাগলেন। কিন্তু কোনো স্তুতিতেই কাজ হলো না। কারণ *চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী*।

একজন তাকে লোহার রড দিয়ে আঘাত করলো, অন্য একজন মাটিতে পড়ে থাকা লোকটিকে লাথি মারলো এবং বললো, শালা যা আছে, সব দিয়ে দে, না হলে একদম শেষ করে দেবো।

গরিব মাদ্রাসায় শিক্ষকের কাছ থেকে সব কিছু – দুইশ টাকা, হাতঘড়ি ছিনিয়ে নেয়া হলো।

তিনি জড় পদার্থের মতো বসে রইলেন।

আমার দুই তিনজন বন্ধু যারা স্কুল অথবা কলেজ থেকে ঝরে পড়ে অবশেষে সর্বহারা পার্টিতে যোগ দিয়েছে এবং একজন বেশ নেতা হয়েছে বলে শুনেছিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাদের একজনের নামও স্মরণ করতে

পারলাম না। অবশেষে নাটোরে পরিচিত সেই নেতার নাম বললাম। তাতে তারা আমাকে মার থেকে রেহাই দিল। কিন্তু বললো, সঙ্গে যা আছে সব দিয়ে দে ভদ্রলোকের মতো।

বুঝতে পারলাম, এদের সঙ্গে কাকুতি–মিনতি করে কোনো লাভ হবে না।

তোমরা সবাই বয়সে আমার ছোট। একটু ভদ্রভাবে কথা বলো। বললাম, আমার নাম মুজিব, বাড়ি পাশের গ্রামে। হ্যান্ডব্যাগ থেকে দশ হাজার টাকা বের করে দিলাম এবং বললাম, এখানে দশ হাজার টাকা আছে। সঙ্গে হাত ঘড়িটিও দিলাম। আমার কাছে পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছু নেই। সমস্ত ভয়–ভীতি উপেক্ষা করে বললাম, তোমার নিশ্চয় বড় ভাই বা গডফাদার আছে। দয়া করে তাকে আমার নামটা মুজিব বলবে।

সর্বহারা ডাকাতগুলোর একজন বললো, কোনো প্রকার চিৎকার না করে সোজা চলে যা।

আমরা জীবনটা হাতে নিয়ে চলে এলাম। সত্যিই কোনো প্রকার চিৎকার করিনি। আসলে চিৎকার করে কোনো লাভও ছিল না। কারণ গ্রামের রাস্তায় তখন একজন লোকও ছিল না।

পরদিন ঈদ।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঈদের আমেজ চারদিকে ছড়িয়ে পরলো।

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঈদ অবশ্যই উপভোগ্য। কিন্তু ঈদের আমেজ কোনোভাবেই আমাকে স্পর্শ করতে পারলো না। ঈদের নামাজে যাওয়ার পরিবর্তে বিছানায় শুয়ে সময় কাটাতে লাগলাম। অবশেষে সকাল পেরিয়ে বিকেল হলো।

বিকাল চারটার সময় আমার ভাতিজা এসে বললো, কাকা, আপনাকে একটি ছেলে ডাকে।

বিছানা ছেড়ে উঠে এলাম। দেখলাম সতেরো আঠারো বছর বয়সের একটি ছেলে। দেখেই বোঝা যায় নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের হবে। লাল শার্টের সঙ্গে অল্প দামি স্কিন টাইট জিন্সের প্যান্ট পরা। তাকে ডাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম।

সে পকেট থেকে একটি ছোট কাগজ বের করে দিল।

তাতে লেখা, বস, কিছু মনে করবেন না, ওরা আপনাকে চিনতে পারেনি। সঙ্গে দশ হাজার টাকার সেই বিশটি পাচশ টাকার নোট।

মুহূর্তের জন্য আমার অনুভূতি স্তব্ধ হয়ে গেল। সমস্ত গায়ের লোম শিউরে উঠলো। কয়েক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে নিজেকে সংযত করলাম। চোখ খুলে ছেলেটির দিকে তাকালাম। তাকে আমার অস্বাভাবিকতা বুঝতে না দিয়ে বললাম, এসো।

তাকে বসার ঘরে বসিয়ে ঈদের দিনের ভুনা খিচুড়ি ও গরুর মাংস খেতে দিলাম। কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথার মধ্য দিয়ে তার খাওয়া শেষ হলো। গত রাতের কোনো কথাই তাকে বললাম না, এমনকি কে তাকে টাকা ও চিরকুটসহ পাঠিয়েছে তাও জিজ্ঞাসা করলাম না।

খাওয়া শেষ করেই সে চলে যেতে চাইলো। আমি তাকে বললাম একা যেতে পারবে? সে হ্যা সূচক উত্তর করার পর তাকে বিদায় করলাম।

ছেলেটি চলে যাওয়ার পর আবার চিরকুটটি পড়লাম। *বস, কিছু মনে করবেন না, ওরা আপনাকে চিনতে পারেনি।*

বার বার পড়লাম। যতোবারই পড়লাম ততোবারই নতুন আত্মপ্রকাশ লাভ করলাম। একজন গডফাদারের আত্মপ্রতিকৃতি নিজের মাঝে অনুভব করলাম। প্রকৃতই যেন গডফাদার হয়ে গেলাম।

এখন যতোবারই বাড়ি যাই ততোবারই আন্দোলিত হই একটু ভয়ে, একটু নির্ভয়ে। তবে কখনোই আর রাত করি না।

md_rha@yahoo.com

দেওলির রাতের ট্রেন

– রাসকিন বন্ড

রাসকিন বন্ড (১৯৩৬) হিমাচল প্রদেশে জন্ম। কিন্তু বসবাস করেন মুসোরি–তে। তিনি লেখাপড়া করেছেন সিমলায় এবং তরুণ বয়সেই লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তার বিখ্যাত একটি উপন্যাসের নাম দি রুম অন দি রুফ এবং তার লেখা খুবই বিখ্যাত একটি ছোট গল্প হলো এ ফ্লাইট অফ পৃজনস – যে গল্পের কাহিনী নিয়ে পরবর্তীতে জুনুন নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। নিচে তার লেখা দি নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি' গল্পটির অনুবাদ প্রকাশিত হলো।

কলেজে পড়ার সময় গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাতাম নানাবাড়ি দেহড়ায়। মে মাসের প্রথমে গিয়ে ফিরতাম একদম জুলাইয়ের শেষ নাগাদ। দেহড়া থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরত্বে আরেকটি ছোট্ট স্টেশনের নাম *দেওলি*। এখান থেকে ইনডিয়ান টেরাইল অঞ্চলের গহীন জঙ্গল শুরু হয়েছে।

ভোর পাচটার দিকে ট্রেন যখন দেওলিতে পৌছাতো তখন স্টেশনের মিটমিটে বৈদ্যুতিক বাতি আর তেল–বাতির ম্লান আলোয় পুরো এলাকা গুমোট অন্ধকারে ডুবে থাকতো। ভোরের আচ্ছন্ন আলোয় জঙ্গলের বুক চিরে এগিয়ে যাওয়া ট্রেন লাইন অস্পষ্ট ভাসতো সামনে। দেওলিতে একটি মাত্র প্ল্যাটফর্ম ছিল, স্টেশনমাস্টারের জন্য একটি অফিস এবং একটি ওয়েটিং রুম। প্ল্যাটফর্মে একটি ছোট চায়ের দোকান, একটি ফলের দোকান আর কিছু বেওয়ারিশ কুকুর ঘুরে বেড়াতো। এগুলো ছাড়া অন্য কিছু দেখিনি এখানে কখনো। তাছাড়া জঙ্গলে প্রবেশের আগে ওই স্টেশনে ট্রেন থামতো মাত্র দশ মিনিটের জন্য।

দেওলিতে ট্রেন থামে কি কারণে তা বুঝতাম না। ওই স্টেশনে কখনোই কিছু হতো না। কেউ ট্রেন থেকে নামে না, কেউ ট্রেনে ওঠেও না। প্ল্যাটফর্মে কোনো কুলি থাকতো না। তারপরও প্রতিবার ট্রেন ওখানে পুরো দশ মিনিট থামতো। ঠিক দশ মিনিট পর একটি বেল বাজতো, গার্ড হুইসল বাজাতো এবং কিছুক্ষণের মধ্যে দেওলিকে পেছন ফেলে ট্রেনে চলে যেতো সামনে স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতো দেওলি নামের ছোট স্টেশনটি।

প্রতিবার যখন দেওলিতে ট্রেন থামতো, ভাবতাম এখানে কি হয়? স্টেশনের ওই দেয়ালের ওপাশে কি আছে? নিঃসঙ্গে ছোট্ট প্ল্যাটফর্মটির জন্য আমার খুব মায়া হতো, খারাপ লাগতো এ জন্য, ওখানে কেউ বেড়াতে আসে না কেন? ঠিক করেছিলান, একদিন দেওলিতে নামবো, শুধু শহরটাকে ধন্য করার জন্য একটি পুরোদিন কাটাবো ওখানে।

তখন আমার বয়স ছিল আঠারো। নানিকে দেখতে দেহড়া যাচ্ছিলাম। যথানিয়মে দেওলিতে ট্রেন থেমেছে। দেখলাম প্ল্যাটফর্মে একটি মেয়ে ঝুড়ি বিক্রি করছে।

ঠাণ্ডা শীতের সকাল। মেয়েটি একটি শাল জড়িয়ে রেখেছে কাধের ওপর। খালি পা। গায়ের কাপড়গুলো পুরনো। কিন্তু কিশোরী মেয়েটি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, সাবলীল ভঙ্গিতে হাটছিল প্ল্যাটফর্মে।

আমার জানালার সামনে এসে মেয়েটি থামলো। বুঝতে পারছিল, কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছিলাম ওকে। তবে মেয়েটি প্রথমে আমাকে না দেখার ভান করলো। মলিন মুখের ত্বক, মাথা ভর্তি উজ্জ্বল কালো চুল, চোখে চঞ্চল দৃষ্টি। তখন তার দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টির মিলন ঘটেছিল ভোরের আবছায়া কুয়াশার বিবশ মুহূর্তে।

মেয়েটি নিঃশব্দে আমার জানালার পাশে দাড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ। আমরা কেউ কোনো কথা বলিনি।

কিন্তু মেয়েটি যখন আমার জানালা ছেড়ে অন্যদিকে চলে গেল, সিট থেকে উঠে দরজার দিকে গেলাম। আমাকে প্ল্যাটফর্মে নামতে দেখে সে অন্যদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল। চায়ের দোকানটির কাছে গেলাম আমি। দোকানে চুলায় অল্প আগুনে একটি কেটলি বসানো, দোকানদার নেই। ট্রেনের ভেতর চা বিক্রি করতে গেছে।

মেয়েটি আমার পেছন পেছন চায়ের দোকানে এলো।

কি ঝুড়ি কিনবেন? আমাকে প্রশ্ন করলো মেয়েটি। এগুলো খুব মজবুত, ভালো বেতের তৈরি।

না, ঝুড়ি লাগবে না। উত্তর দিলাম।

অনেকক্ষণ চুপ করে দাড়িয়ে ছিলাম আমরা। দুজনের দৃষ্টি দুজনের দিকে। মেয়েটি আবার প্রশ্ন করলো, আপনার কি সত্যি ঝুড়ির দরকার নেই?

ঠিক আছে, দাও একটা বলে ওপর থেকে একটি ঝুড়ি নিয়ে এক রূপি দাম দিলাম ওর হাতে। এসবের মধ্যে হাতে হাত স্পর্শ হয়েছিল হয়তো। তবে অবশ্যই ইচ্ছাকৃত ছিল না সেসব।

মেয়েটি কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল, কিন্তু গার্ড হুইসল বাজালো। বেল আর ইঞ্জিনের গর্জনে তার কোনো কথা শুনতে পারিনি। এক দৌড়ে আমার বগি গিয়ে উঠেছিলাম মনে আছে। তারপর আবার ঝিকঝিক শব্দ আর ছন্দময় দুলুনি তুলে ট্রেন চলে গেল সামনের পথে।

যতোক্ষণ দেখা গেল, মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম। একা প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়েছিল সে, এক ইঞ্চি নড়েনি, এক পলকের জন্য সরায়নি দৃষ্টি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকিয়ে ছিল আমার দিকে, অদ্ভুত এক টুকরো হাসি ছিল তার ঠোটে। রাস্তার পাশে সিগনাল বক্স না আসা পর্যন্ত তাকিয়েছিলাম, তারপর জঙ্গলের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল দেওলির নির্জন রেল স্টেশন। তখনো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম গভীর চোখের এক মেয়ে শূন্য প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে আছে বিস্মিত, অর্থহীন দৃষ্টি মেলে।

সেদিন বাকি পথটুকু পুরো সময় জেগে বসে ছিলাম আমি। মাথা থেকে মেয়েটির মুখ আর গভীর চোখের অপরূপ ছবিটি মুছতে পারছিলাম না কোনোভাবে।

কিন্তু দেহড়া পৌছানোর পর দেওলির এই ঘটনা ঝাপসা হয়ে গেল। কারণ তখন অন্য অনেক চমকপ্রদ ঘটনা এসে আমার মন থেকে এক ভোরের নির্জন প্ল্যাটফর্মের সাধারণ এক মেয়ের কথা মুছে দিয়েছিল খুব সহজেই। তবে দুই মাস পর ফেরার পথে একই জায়গায় আবার মনে জাগিয়ে তুললো এতো দিন ভুলে থাকা অসাধারণ এক মেয়ের জন্য ব্যাকুল বাসনা।

ফেরার সময় ট্রেন যখন দেওলি থামলো, দৌড়ে নামলা স্টেশনে, প্ল্যাটফর্মে মেয়েটিকে দেখে দারুণ উতলা হাওয়া বয়ে গেল আমার বুকে। আনন্দে সজোরে হাত নাড়লাম ওর দিকে।

আমাকে দেখে হাসলো সে। তাকে মনে রেখেছি বলে ভীষণ খুশি হলো।

আমিও খুশি হয়েছিলাম সে আমাকে মনে রেখেছে বলে।

আমরা দুজনই তখন ভীষণ আনন্দিত, উদ্বেলিত।

দীর্ঘ দিন পর পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে যেমন হয়।

এবার মেয়েটি ঝুড়ি বিক্রি করতে ছুটে গেল না ট্রেনের জানালায়, বরং আমার সঙ্গে চায়ের দোকানে গেল। তার গভীর চোখজোড়া তখন উজ্জ্বল তারার মতো জ্বলছিল। অনেকক্ষণ আমরা কেউ কথা বলিনি। কিন্তু ওই মুহূর্তে তার চেয়ে বেশি মুখর হতে পারতাম না কিছুতেই। ভোরের বিষণ্ণ আলোয় চায়ের দোকানে বসে তীব্রভাবে মনে হচ্ছিল মেয়েটিকে তখনই ট্রেনে করে নিয়ে আসি আমার সঙ্গে।

নির্জন স্টেশনে দাড়িয়ে সে দুঃখী মুখে তাকিয়ে থাকবে আমাকে নিয়ে চলে যাওয়া ট্রেনের পানে। এই দৃশ্য মনে করে বুক বুঝি ভেঙেই যাচ্ছিল আমার কঠিন ব্যাথায়। তার হাত থেকে ঝুড়িগুলো নিয়ে মাটিতে ফেলে দিলাম। ও এক হাত বাড়িয়েছে ঝুড়ি তোলার জন্য। কিন্তু আমার হাত ধরে ফেললো সেই হাত এবং ধরেই থাকলো।

আমাকে দিল্লি যেতে হবে। আমি বলেছিলাম।

মেয়েটি মাথা নাড়লো, আমার কোথাও যেতে হয় না।

আবেগ প্রকাশের এমন চরম মুহূর্তে অত্যন্ত অবিবেচকের মতো হুইসল বাজিয়ে দিল গার্ড ব্যাটা। কি যে রাগ লেগেছিল সেদিন গার্ডের ওপর আমার।

আবার আসবো। বললাম।

মেয়েটি মাথা নেড়েছিল শুধু নিঃশব্দে।

ততোক্ষণে ট্রেন চলতে শুরু করেছে ধিরে ধিরে।

ওর হাত থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিলাম ট্রেন ধরার জন্য।

এবার আর এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিনি তার কথা। পুরো ভ্রমণকাল এবং পরবর্তী দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমার ভেতর তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল মেয়েটির জন্য। সারাটা বছর ধরে সে আমার চোখের সামনে সচল ও জীবন্ত হয়ে রইলো।

ওই বছর বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ গুছিয়ে রওনা হলাম। অন্যবারের চেয়ে অনেক আগেভাগে রওনা হয়েছিলাম নানাবাড়ির উদ্দেশ্যে। নানিকে দেখার জন্য আমার অমন অস্থির হয়ে ছুটে যাওয়ায় তিনি হয়তো বেশ প্রীত হয়েছিলেন মনে মনে।

ট্রেন দেওলিতে থামতেই আমার ভীষণ নার্ভাস আর ভয় লাগছিল। ভাবছিলাম, ওকে কিভাবে কি কথা বলবো। মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম যাতে ওর সামনে গিয়ে আবার বোকার মতো চুপ করে দাড়িয়ে না থাকি। বিড়বিড় করে রিহার্সাল দিলাম বেশ কয়েকবার। অনেক কথা বলবো বা এমন কিছু করা যাতে ওকে আমার মনের কথা জানাতে পারি।

ট্রেন থেমেছে দেওলিতে। প্ল্যাটফর্মের উপর থেকে নিচে, এমাথা থেকে ওমাথা তন্ন তন্ন করে খুজলাম, কোথাও দেখলাম না ওকে।

ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে দাড়ালাম। আমার মন গভীর বিষাদে নত, আশাহতের বেদনায় ভারাক্রান্ত হৃদয়। অনুভব করছিলাম, আমার এখন কিছু একটা করতে হবে। স্টেশনমাস্টারের কাছে ছুটে গেলাম, এখানে যে একটি মেয়ে ঝুড়ি বেচতে আসতো তাকে চেনেন?

উত্তরে স্টেশনমাস্টার বলে, না, চিনি না। তবে আপনার এখানে থেকে যাবার ইচ্ছা না থাকলে এখনি গিয়ে ট্রেনে উঠুন।

প্ল্যাটফর্মের সবখানে পাগলের মতো খুজলাম মেয়েটিকে। স্টেশন মাঠের রেলিংয়ের ওপাশে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম অভাগার মতো। শুধু একটি বড় আম গাছ আর জঙ্গলের ভেতর একে-বেকে ঢুকে যাওয়া মাটির রাস্তা ছাড়া কিছুই নজরে পড়ে না। ওই মাটির রাস্তাটি কোথায় গিয়েছে? ভাবতে ভাবতেই ট্রেন চলা শুরু করেছে। সুতরাং ট্রেনে উঠে বসলাম। গতি বাড়িয়ে দ্রুত ছুটছে ট্রেন, স্থবির আমি অনড় বসে থাকি জানালার সামনে শূন্য দৃষ্টি মেলে।

সেই মেয়েকে কোথায় খুজবো যাকে দেখেছি মাত্র দুইবার, যার সঙ্গে সামান্য কয়েকটি বাক্য বিনিময় হয়েছে এবং যার সম্পর্কে কিছু জানি না আমি, কিছুই না। কিন্তু তার জন্য আমার মনে পরম এক ভালোবাসা এবং দায়িত্ব বোধ তৈরি হয়েছে যা আগে কখনো হয়নি।

নানি আমার অসময়ের উপস্থিতিতে খুশি হয় না কারণ সে বছর দু সপ্তাহের বেশি থাকিনি নানাবাড়িতে। সারাক্ষণ অস্থির আর অসহ্য লাগছিল। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম, যাতে দেওলির স্টেশন মাস্টারকে আরেকবার ঝুড়িওয়ালির কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি।

ফেরার সময় দেখলাম ওখানে নতুন স্টেশন মাস্টার এসেছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে আগের লোকটির অন্য কোথাও পোস্টিং হয়ে গেছে। নতুন এই মাস্টারটি স্টেশনে ঝুড়ি বিক্রি করতে আসা কোনো মেয়ে সম্পর্কে একটি কথাও বলতে পারলো না।

চায়ের দোকানদারকে খুজে বের করলাম। মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যা। এমন একটি মেয়ে আসতো এখানে। আমার পরিষ্কার মনে আছে। দোকানদার জানায়। কিন্তু এখন আর আসে না।

কেন? জিজ্ঞাসা করলাম। কি হয়েছে তার?

আমি কিভাবে জানবো? লোকটি বললো। সে তো আমার কেউ না।

এরপর আবার আমাকে দৌড়াতে হলো ট্রেনের দিকে।

দেওলির প্ল্যাটফর্মে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ঠিক করেছিলাম, কোনো একদিন এখানে আমার ভ্রমণ স্থগিত করবো। শহরে গিয়ে সারা দিন কাটাবো, সবার কাছে জিজ্ঞাসা করবো এবং তাকে খুজে বের করবো, মেয়ে শুধু গভীর চোখের অস্থির দৃষ্টি হেনে আমার হৃদয় চুরি করেছে।

এই সংকল্প বুকে পুষে নিজেকে কলেজের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত সান্ত্বনা দিয়ে রাখলাম। গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে ফের রওনা হলাম দেহড়ার উদ্দেশ্যে। ভোরের আবছা আলোয় ট্রেন যখন দেওলিতে থামলো, আকুল হয়ে প্ল্যাটফর্মে একটি মেয়ের মুখ কামনা করছিলাম। জানতাম, হয়তো তাকে দেখতে পাবো না আর, তবু আশা করতাম তাকে দেখার।

যে কোনো কারণেই হোক, দেওলিতে থামা হয়নি আমার কখনো, পুরো একটি দিন ওখানে কাটানোর যে সংকল্প করেছিলাম মনে মনে তাও পূরণ করা হয়নি। এটা যদি কোনো কল্পকাহিনী বা সিনেমা হতো তাহলে হয়তো ওই স্টেশনে নামতাম এবং সব রহস্যের সমাধান করে পুরো বিষয়টিতে একটি উপযুক্ত সমাপ্তি টানতে পারতাম। আমার মনে হয়, আমি আসলে ভয় পেয়েছিলাম। সত্যি কথা জেনে ফেলার ভয়। হয়তো মেয়েটি দেওলিতে থাকে না আর, হয়তো তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, হয়তো সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং ...

গত কয়েক বছরে দেওলি পার হয়েছি অনেকবার। প্রতিবারে ট্রেনের জানালায় বসে মনের অজান্তে আশা করেছি অপরিবর্তিত একটি মুখ। মিষ্টি হেসে তাকিয়ে থাকবে আমার দিকে। জানি না দেওলির ওই স্টেশনের দেয়ালের ওপারে আসলে কি ঘটেছিল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এটা জানি, ওখানে যাত্রা থামিয়ে মেয়েটির হরিয়ে যাওয়ার রহস্যের কারণ অনুসন্ধান করতে যাবো না কোনোদিন। বরং প্রতিবার আসা–যাওয়ার পথে জানালায় বসে নিঃসঙ্গ প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে থাকবো ব্যাকুল দৃষ্টিতে। মনের মধ্যে আশা আর স্বপ্নের রঙিন জাল বুনতে বুনতে অপেক্ষা করবো এবং তারপরও অপেক্ষা করবো ভালো বেতের তৈরি ঝুড়ি বিক্রি করতে আসা গভীর চোখের অল্প দেখা এক কন্যার জন্য।

দেওলি স্টেশনে এরপর আর কখনো নামিনি। কিন্তু যতো বেশিবার সম্ভব ওই স্টেশনের ওপর দিয়ে আসা–যাওয়া করি।

এখনো।

অনুবাদ : লুনা রাহনুমা

আমেরিকার বিচিত্র আইন

– ডা. মঞ্জুরুল হাকিম তুহিন

আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের শহরগুলোতে বিচিত্র এমন কিছু আইন জারি রয়েছে যার প্রমাণ পাওয়া যায় ওই সব শহরের প্রাচীন দলিল দস্তাবেজে। অদ্ভুত সেই আইনগুলোর কিছু এখনো লিপিবদ্ধ আছে আইনের নথিতে, আবার কিছু মজাদার আইন বর্তমান প্রেক্ষাপটে অব্যবহার্য বা বাতিল ঘোষিত হয়েছে।

গাড়ির শহর ডেট্রয়েট–এ দম্পতিদের যত্রতত্র গাড়ির ভেতরে প্রেম করা নিষিদ্ধ। প্রেম করা যাবে যদি গাড়িটি পার্ক করা থাকে নিজস্ব সম্পত্তিতে।

আইডাহো স্টেটের আইন বলে, একজন পুরুষ তার প্রেমিকাকে পঞ্চাশ পাউন্ডের কম ওজনের ক্যান্ডির বাক্স উপহার দিতে পারবে না।

ওহাইও–র অক্সফোর্ড–এ পুরুষ মানুষের ছবির সামনে দাড়িয়ে মহিলাদের কাপড় খোলা বা বদলানো নিষিদ্ধ।

ডেনভার–এ পাশের বাড়িতে প্রতিবেশীকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ধার দেয়া আইন বিরুদ্ধ।

জর্জিয়ার জোন্সবরোতে *ওহ বয়!* বলা বেআইনি।

ইউটাহ রাজ্যে ঘোড়ার পিঠে চড়ে মাছ ধরা নিষেধ আর ক্যানসাস–এ খালি হাতে কেউ মাছ ধরতে পারবে না।

ক্যালিফোর্নিয়ার কারো কাছে ভালুকের পিত্তথলি পাওয়া গেলে তাকে গ্রেফতার হতে হবে। এই রাজ্যে কোনো স্কুল, সরাইখানা বা উপাসনা গৃহের এক হাজার পাচশ ফিটের মধ্যে জন্তু–জানোয়ারের প্রকাশ্যে মিলন নিষিদ্ধ। ১৯৩০ সালে এ রাজ্যের ওন্টারিও সিটি কাউন্সিল কর্তৃক জারিকৃত অর্ডিনান্স মোতাবেক শহরের সীমানার ভেতরে কোনো মোরগের *কক কক* ডাকা নিষেধ।

কানেকটিকাট ডেভন–এ সূর্যাস্তের পর পেছন দিকে বা উল্টো হাটা বেআইনি। এই রাজ্যের হারফোর্ড–এ হাতে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে হেটে রাস্তা ক্রস করা নিষেধ।

পেনসিলভানিয়া–র রাজ্য আইনে বাথটবে বসে গান গাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক সিটি ট্রানজিট অথরিটির আইন বলে, সাবওয়েতে পুরুষদের মতো মহিলারাও ঊর্ধাঙ্গ অনাবৃত করে যাতায়াত করতে পারবে। তবে সাবওয়েতে ধূমপান নিষেধ।

ওয়াশিংটনের সিয়াটল–এ ছয় ফিটের বেশি লম্বা কোনো অস্ত্র লুকিয়ে বহন করা বেআইনি। এই রাজ্যের উইলবার–এ কুৎসিত ঘোড়ায় চড়া নিষিদ্ধ।

টেনেসি–তে চলন্ত গাড়ি থেকে গুলি করে পাখি শিকার করা যাবে না। তবে তিমি শিকার করা যাবে। এ রাজ্যে মেমফিস–এ মহিলাদের গাড়ি চালনা নিষিদ্ধ। তবে কোনো পুরুষ যদি গাড়ির সামনে হেটে বা দৌড়ে লাল পতাকা উড়িয়ে আগত মোটরচালক ও পথচারীদের সাবধান করতে করতে ছুটে যায় তাহলে ললনাদের মোটর চালনা আইনসম্মত হবে।

ইলিনয়েস–এর কার্কল্যান্ড–এ গ্রামের কোনো রাস্তার ওপর দিয়ে মৌমাছির উড়ে যাওয়া নিষেধ। এই রাজ্যের জীয়ন–এ পোষা কুকুর বা বেড়ালের মুখে জ্বলন্ত সিগার দেয়া বেআইনি।

লস এঞ্জেলেস–এ একই বাথটাবে এক সঙ্গে দুটো শিশুকে গোসল করানো দণ্ডনীয় অপরাধ। এ রাজ্যে একজন পুরুষ মানুষ আইনগত ভাবে তার স্ত্রীকে চামড়ার বেল্ট বা স্ট্র্যাপ দিয়ে প্রহার করতে পারবে। তবে সেই বেল্টটি দুই ইঞ্চির বেশি চওড়া হতে পারবে না যদি না তার স্ত্রী আরো চওড়া বেল্ট দিয়ে পেটানোর জন্য তাকে সম্মতি দেয়।

মিশিগান–এ স্বামীর অনুমতি ছাড়া মহিলাদের চুল কাটা নিষেধ। এই রাজ্যের ক্লসন–এ একজন কৃষক তার ফার্মের শূকর, গরু, ঘোড়া, ছাগল ও মুরগির সঙ্গে একই বিছানায় শুতে পারবে বৈধভাবে।

সান ফ্রান্সিসকোর পতিতারা পঞ্চাশ ডলার–এর বেশি বিলের ভাংতি দিতে বাধ্য নয়।

নিউ হ্যাম্পাশায়ার–এর কোনো সরাইখানা, রেস্তোরা বা কাফেতে গান শুনতে শুনতে পা নাচানো, মাথা ঝাকানো নিষেধ।

শিকাগো–তে আগুন ধরে গেছে এমন জায়গায় বসে খাওয়া দাওয়া করা বেআইনি।

পশ্চিম ভার্জিনিয়ার নিকোলাস কাউন্টির গির্জায় প্রার্থনাকালে ধর্মযাজকদের বেদিতে দাড়িয়ে কৌতুক বা হাস্যরসাত্মক গল্প বলা নিষেধ।

বাল্টিমোর–এ পোষা সিংহকে সঙ্গে নিয়ে মুভি দেখতে যাওয়া নিষিদ্ধ। এই শহরের সীমানার মধ্যে দোতলার জানালা দিয়ে নিচে খড়ের গাদা ছুড়ে ফেলাও নিষেধ।

ইনডিয়ানা–র গ্যারিতে কোনো ব্যক্তি রসুন খাওয়ার চার ঘণ্টার মধ্যে কোনো সিনেমা হল বা থিয়েটারে যেতে কিংবা পাবলিক পরিবহনে চড়তে পারবে না।

মায়ামি–তে স্ট্র্যাপ ছাড়া গাউন পরে কোনো পুরুষ মানুষ প্রকাশ্যে বের হতে পারবে না।

সেন্ট লুইস–এ শহরের রাস্তার বাকে বা মোড়ে বসে আড্ডা দেয়া এবং বালতি থেকে বিয়ার বের করে খাওয়া অবৈধ।

ওকলাহোমা-র টুলসাতে লাইসেন্সধারী ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধান ছাড়া সোডা ওয়াটারের বোতল খোলা আইনত দণ্ডনীয়।

চট্টগ্রাম থেকে

ঘিয়ের শিরনি ও কুকুর দল

– তাপস মোস্তফা

কোনো ঘটনাকে গল্পের আদলে বর্ণনা করার যোগ্যতা আমার নেই বললেই চলে। কোনো কৌতুক বলে কাউকে কখনো হাসাতে পেরেছি এমন দাবি করা বাগাড়ম্বর হবে। আমাদের আশপাশে অনেকেই আছেন যারা সাধারণ ঘটনাকেও এমন আকর্ষণীয়ভাবে বয়ান করতে পারেন যে, মাঝে মধ্যে বলে ফেলি, এরা রাজনৈতিক ক্যানভাসার হলেই ভালো হতো। আমার পরিচিত এমনি একজনের বলা একটা গল্প নিচে বয়ান করবো। গল্পটি তিনি যেভাবে বলেছিলেন তা হুবহু তুলে ধরতে চেষ্টা করা হবে।

আসুন গল্পটি বয়ান করি।

তোমরা তো জানো, আমি কেমন বান্দর ছিলাম। আমার বান্দরামিতে অতিষ্ঠ হয়ে ক্লাস নাইনে ওঠার পর বাবা আমাকে স্কুলের হস্টেলে পাঠিয়ে দেন। আর এবি স্যারকে তো জানো কেমন দজ্জাল। তখন এবি স্যার ছিল হস্টেল সুপার। তার উৎপাতে সন্ধ্যা হলে আমাকে অন্যদের সঙ্গে বই নিয়ে বসতে হতো। অবশ্য পড়ালেখা কেমন করেছি তা তো দেখতে পাচ্ছ। এবি স্যার রাত দশটা পর্যন্ত হস্টেলে থেকে বাড়ি চলে যেতেন। তখন ছিল আমাদের বান্দরামির সময়। বান্দর গ্রুপের সবার নাম বলা যাবে না। বোঝো তো, অনেকে এখন ভালো মানুষ হয়ে গেছে। তখন তো এ রকম রাজনীতি ছিল না। কোনো কাজকে রাজনীতির নিক্তিতে মাপা হতো না। আমরা প্রায়ই রাতে মাঠে খেলাধুলা করতাম। মাঝে মধ্যে ডাব চুরি, মুরগি চুরি এসব করে বেড়াতাম। মুরগি চুরির জন্য দুই একবার আমরা মারও খেয়েছি। অনেক মজার ঘটনাও ঘটেছে। তবে তোমাদের আজকে একটা ঘটনা বলবো।

সেটা ছিল শীতের সময়। ক্লাস টেনের নির্বাচনী পরীক্ষার পর তখনো ফাইনাল পরীক্ষার জন্য কোচিং ক্লাস শুরু হয়নি। একদিন রাতে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম রসের শিরনি রাধবো। রস ও চাল জোগাড়ের পর ঝুনা নারকেলও আনা হলো।

শিরনি রান্না শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় একজন বললো, মিষ্টির দোকান থেকে চল ঘি নিয়ে আসি।

যেই বলা অমনি দুই তিনজন গেলাম মিষ্টির দোকানে। আজকের মতো তখন দোকানের বেড়া টিনের ছিল না। বাশের বেড়া। এক জায়গায় ছিল বেড়া ভাঙা। ওই জায়গা দিয়ে ঢুকে পাটের ছিক্কা থেকে এক বোয়ম ঘি নিয়ে এসে শিরনিতে দেয়ার পর দেখা গেল শিরনির ঘ্রাণ পাল্টে গেছে। গন্ধে জিভে পানি এসে গেল। চুলা থেকে নামানোর পর সবাই তাড়াতাড়ি মাটির বাসন নিয়ে বেশ করে শিরনি নিয়ে খেতে শুরু করলাম।

গরম গরম খেতে গিয়ে অনেকে জিভ পুড়িয়ে ফেললো।

কিন্তু বিপদ দেখা দিল শিরনি ঠাণ্ডা হয়ে আসতেই। বাসনে নেয়া শিরনির দুই আনাও কেউ খেতে পারলো না। কারণ হিসেবে সবাই একমত হলো, ঘি-এর কারণে খাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে ডেকচিতেও শিরনি রয়ে গেছে। দিনের আলোতে এসব চুরি করা জিনিসের তৈরি শিরনির কথা জানাজানি হলে কি রকম মার খেতে হবে তা ভেবে সব শিরনি বাজারের কুকুরকে খাওয়ানো হলো।

তারপর ডেকচি, বাসন সব কিছু ধুয়ে জায়গা মতো রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন ভালো মানুষের মতোই জেগে উঠলাম। কেউ জানতেও পারলো না, আমরা রাতে কি করেছি। বিকেলের দিকে খেয়াল করলাম, বাজারের কুকুরগুলোর ডাকাডাকি থেমে গেছে।

একজন বললো, নিশ্চয়ই রাতে ঘেউ ঘেউ করবে।

কান খাড়া করে সন্ধ্যায় পড়তে বসলাম। কিন্তু কোথাও কোনো শব্দ নেই। সারা রাতও কোনো ঘেউ ঘেউ শোনা গেল না।

পরদিন সকালে বান্দর গ্রুপ সিদ্ধান্ত নিলাম রহস্য উদঘাটনের।

বেলা বাড়ার পর অনুসন্ধানে জানা গেল আসল ঘটনা। ঘিয়ের শিরনি খেয়ে সব কুকুরের পেট নেমে গেছে। ঘেউ ঘউ করতে গেলেই পায়ুপথ হা হয়ে মল বের হয়ে আসছে।

ওনার গল্পের মাঝে কেউ কথা না বললেও এবার একজন বলে উঠলো, এ জন্যই তো বলে, কুকুরের পেটে ঘি সয় না।

কারো হাসি সেদিন থামতে চাইছিল না।

আমাদের সে গল্পকার স্বজন ইহধামে নেই। আর শোনা হবে না এমন রসালো গল্প।

শিবের হাট, চট্টগ্রাম থেকে

রহস্য

– মোহাম্মদ লুৎফর রহমান জুলহাস

ঈদ সবাইকে আনন্দ দিলেও আমাকে দিয়েছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ গর্ভধারিণী মা হারানোর বেদনা।

আমরা ছিলাম নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের। তাই সকল চাহিদা ঠিক মতো পূরণ হতো না। আব্বা ছিলেন সাধারণ এক শিক্ষক। শিক্ষকতার পাশাপাশি বাড়ির পাশে ইরি ধান করার জন্য নদী থেকে পাওয়ার পাম্পের সাহায্যে পানি তুলে জমিতে দেয়ার মেশিন পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সংসারে অর্থ জোগান দেয়ার জন্য।

শিক্ষকতার ফাকে ফাকে ওখানে বেশি সময় দিতেন। এমনকি রাতে সেখানে থাকতেন। বাড়ি থেকে খাবার দিয়ে আসতাম আমি।

১৯৮৯ সালের রমজানের ঈদ ছিল আমার বুক ভরা বেদনার ঈদ। কারো জীবনে সৃষ্টিকর্তা যেন এমন ঈদ আর না দেয় এই কামনা করি।

রমজান মাসের ত্রিশটি রোজা আমার মা রেখেছিলেন। ত্রিশ রোজার দিন অর্থাৎ ঈদের আগের দিন মা আমার একমাত্র ছোট বোনকে নিয়ে আমার নানার বাড়িতে গিয়েছিলেন। নানার বাড়ি কাছে থাকায় আমাদের সঙ্গে নেননি। প্রচণ্ড রোদ ছিল ওই দিন। আমার মা ছিলেন ফর্শা। তাই রোদে মা লাল হয়ে গিয়েছিলেন।

জীবনের শেষ বাপের বাড়ি যাওয়া ছিল এটা আমার মায়ের। কি কারণে গিয়ে ছিলেন তা বলতে পারবো না। তবে সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়েছিলেন।

নানি জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিসের জন্য গিয়েছিল।

মা বলেছিলেন তোমাদের দেখতে এসেছি।

মামারা বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করেন তাই ঈদের আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে এসেছিলেন। মা দুপুরে নানির বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাই মামাদের সঙ্গে দেখা হয়নি।

আমার মা বাড়িতে এসে ঈদের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। পরের দিন ঈদ। একা মানুষ আমাদের সঙ্গে ফুপু, চাচি কেউ নেই। আমার আব্বার কোনো বোন ছিল না আর কাকা ছিলেন ছোট, আমাদের সঙ্গেই থাকতেন।

মা খুব আগ্রহ নিয়ে সব কিছু তৈরি করেছিলেন। গ্রামে ঈদের দিন হাতের তৈরি চালের গুড়া দিয়ে সেমাই তৈরি করা হয়। ঝুরি, ফুল পিঠা, পাতার পিঠা, ঝিকিমিকি পিঠা, শামুক পিঠা ইত্যাদি আরো অনেক আইটেম।

সব কিছু আগের দিন রেডি করেছিলেন যাতে করে ঈদের দিন ঝামেলায় পড়তে না হয়। এমনকি মরিচ, হলুদ, জিরা, ধনিয়া ভাটা তৈরি করে রেখেছিলেন। এগুলো তৈরি করতে মায়ের রাত নয়টা বেজে গিয়েছিল।

মাকে বলেছিলাম, ঝুরি সিরাত দিতে (ভাতের চাল রান্না করে বিশেষ পদ্ধতিতে চালুনির ছিদ্র দিয়ে পিষিয়ে রোদে শুকিয়ে গুড়ের সিরায় ভিজিয়ে ঝুরি তৈরি করতে হয়)।

মা বলেছিলেন আমার শরীরটা এখন ভালো লাগছে না, সকালে তৈরি করে দেবো। সেই সকাল ঠিকই হয়েছিল। কিন্তু মায়ের ঝুরি তৈরি করার সময় ছিল না।

রাত সাড়ে নয়টায় মা আমাকে এবং আরো তিন ভাইবোনকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন। আব্বা সঙ্গীদের বেতন–বোনাস দিতে দিতে অনেক রাত করে ফেলেছিলেন। এরই মধ্যে ঘটে গেল সব কিছু।

রাত এগারোটায় প্রস্রাবের বেগ হলে মাকে ডাকতে থাকি। কারণ আমি ছিলাম সবার বড়। ঘরে লাইট জ্বালিয়ে দেখি মা বিছানায় নেই এবং ঘরের শিকল বাইরে থেকে আটকানো।

উঠে দরজা ধাক্কাতে থাকি এবং চিৎকার দিতে থাকি দরজা খোলার জন্য।

অবশেষে দা দিয়ে দরজার উপরে ভেলকির রশি কেটে হাত দিয়ে দরজার শিকল খুলি। আবার শিকল আটকিয়ে অন্য চাচিদের ঘরে মাকে খুজতে থাকি।

এক এক করে সবার ঘর খোজা শেষ করে আব্বার কাছে খবর দিই। নানির বাড়িতে লোক পাঠাই।

আমার এক চাচাতো ভাই ঢাকা থেকে বাড়িতে এসে মা নিখোজ হওয়ার খবর শুনে বলেন, চল লাইট নিয়ে পাশ্ববর্তী জংগলে নদীর ধারে খোজ করে দেখি।

এক এক করে খুজতে লাগছিলাম।

সবাই লোক খুজতে বের হয়েছে। ঈদের আগের রাত। তাই অনেক লোক তখনো ঘুমায়নি। আমি এবং চাচাতো ভাই নদীর ধারে গিয়ে দেখি মায়ের লাশ পানিতে ভাসছে।

চুলগুলো এলোমেলো, হাটু পানি। অথচ মায়ের দেহ ভাসমান। নদীর পাড়ে মায়ের পায়ের স্যান্ডাল এবং বদনা সাজানো অবস্থায় ছিল।

মায়ের দেহ চাচাতো ভাইয়ের সাহায্যে বাড়িতে আনি। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আনি। ডাক্তার এসে বলে তিনি আর জীবিত নেই, মৃত।

এই সময়ের মধ্যে আব্বা এবং নানার বাড়ি সবাই এসে হাজির। মায়ের লাশ দেখে সবাই কান্নার রোল তোলে।

তখন আমার ছোট ভাইবোনকে ঘুম থেকে তুলে মায়ের লাশের পাশে বসাই।

তারা শুধু মৃত মায়ের দিকে তাকিয়েছিল, তারা জানে না তাদের মা তাদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেছে।

এখন তারা অনেক বড় হয়েছে। বড় চাকরি করে। বোনটাকে বিয়ে দিয়েছি। এক ছেলে আছে।

ছোটবেলায় না বুঝলেও এখন তারা মায়ের কথা মনে করে হাহাকার করে কান্নায় চোখের পানি ফেলে।

জানি না তাদের এবং আমার চোখের পানি এভাবে আর কতোদিন পড়বে।

ঈদের আগের দিন মায়ের মৃত লাশের পাশে বসে কান্নাকাটি করে রাত পার করেছিলাম। সকালে ঈদের নামাজ পড়ে মায়ের জানাজার নামাজ পড়েছিলাম। মায়ের জানাজায় এতো লোক হয়েছিল, আজ ষোল বছরে কোনো লোকের জানাজায় এতো লোক হয়নি।

মায়ের মৃত্যু কারণ হিসেবে অনেকে বলেছিল, জ্বিন–ভূতের আছর। আব্বা এবং নানার বাড়ি লোক বলেছিল, পরিকল্পিত মাকে হত্যা করা হয়েছে জমির লোভে।

আজ এতো বছরেও মায়ের মৃত্যুর আসল রহস্য জানতে পারিনি। কিছু কিছু ঘটনা, পরিস্থিতি, ঝগড়া, সন্দেহে অনুমান করা যায় এটা আমার এক চাচার কাজ।

আমরা ওই দিন ঠিক দুনিয়ার আদালতে বিচার চাইনি মায়ের মৃত্যুর জন্য। শুধু বলেছিলাম, মায়ের মৃত্যুতে যদি কারো হাত থাকে তবে যেন আল্লাহতাআলা তার উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে দুনিয়ার মানুষকে দেখায়। আল্লাহর আদালতে সেই দিন বিচার দিয়েছিলাম।

কালিগঞ্জ, গাজীপুর থেকে

বেদনা

আমার এক সহপাঠী ছেলেবন্ধু আমাকে খুব ভালোবাসতো। আমার নোট, বই যখন যা দরকার এনে দেয়। আমাদের পরিবারের সকলেই তাকে আদর করে। সেই সুবাদে আমিও মাঝে মধ্যে তাদের বাসায় বেড়াতে যেতাম। কিন্তু কোনোদিন আমার সঙ্গে কোনো প্রকার খারাপ আচরণ করেনি।

কয়েক বছর আগে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই। সে কি আনন্দ! এর কিছুদিন পরে আসে ঈদের দিন। এর মধ্যে আমার ছেলেবন্ধুটিও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়। এমনি আনন্দের মধ্যে বন্ধু প্রবর আমাকে ঈদের দিন সময় সুযোগ বুঝে বেড়াতে নিয়ে যায়। গিয়ে দেখি তার বাড়িতে কেউ নেই। সবাই বেড়াতে গেছে। এক পর্যায়ে আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ হই। একজন আরেকজনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ হওয়াই আমার জীবনের কাল হলো। কয়েক মাস পর অনুভব করলাম আমি গর্ভবতী।

তারপরের ইতিহাস খুবই কষ্টের, বর্ণনাতীত। এরপর প্রতিটি ঈদের দিনকেই বেদনার দিন মনে হয়। পাঠক–পাঠিকা ভাইবোনদের অনুরোধ করবো, ঈদের দিনে আনন্দের উচ্ছ্বাসে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে কারো জীবনকে দুর্বিষহ করবেন না বা নিজের জীবন ধ্বংস করবেন না।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

নোনা জলে বন্দী

– ইফতি

চোখের একদম সামনে দিয়ে বিশাল মাস্তুল মেলে কর্ণফুলি মোহনা অতিক্রম করা প্রকাণ্ড জাহাজগুলো জানি না কতো অসংখ্যবার আমারই অজান্তে আমাকে চুরি করে নিয়ে গেছে সীমাহীন সাগর–মহাসাগরে। আমার সেদিনের কিশোর মনের গভীর কল্পনার রঙে রঞ্জিত সেই সুনীল আটলান্টিকের সঙ্গে আজকের আটলান্টিককে মেলাতে পারি না কিছুতেই।

আমার পেশার বিশ্বগত সম্পৃক্ততার কারণে অপূর্ব বৈচিত্রে ঘেরা এ জীবনের বিচিত্র রূপ উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে যে প্রগাঢ় এক চেতনা বোধ আমার ভেতরটাকে আন্দোলিত করে তা হলো, মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখা।

১৯৯৫ সালের শেষ সপ্তাহ। ক্যারিয়ারের ঊষালগ্ন। শিক্ষানবিশ হিসেবে বাংলাদেশি মালিকের থাই–চার্টারকৃত আমার প্রথম জাহাজে নিযুক্তির সংবাদ এলো। উড়োজাহাজে চড়ে কল্পনার রাজ্যে ভেসে যথাসময়ে সিংগাপুরে গিয়ে উঠে গেলাম আমার সাধের জলজাহাজে। কঠিন শৃঙ্খলা আর কঠোর পরিশ্রমে ভরা এ এক ভিন্ন জীবন যেখানে আমাকে অনেকটা নবজন্ম লাভ করতে হলো বললে মিথ্যে বলা হবে না।

সম্ভবতঃ নটর ডেম–এ ইংরেজি সাহিত্যে পড়েছিলাম কোলরিজ–এর The Ancient Mariner কবিতাটি, যেখানে ছিল Water water everywhere, but not a drop to drink!

এখানকার জীবনটা যেন এ কবিতারই প্রতিচ্ছবি। এভাবেই চলে যাচ্ছিল আমার বিশ্রী রকম ব্যস্ততায় ভরা দিনগুলো, সেই সঙ্গে জাহাজের ব্যবসাও ছিল রমরমা। চলাচল ছিল সিংগাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম আর ইন্দোনেশিয়ার মাঝে।

এরই মাঝে তিন মাসের কিছু বেশি সময় পেরিয়ে এসেছি, যদিও আমার মনে হচ্ছিল যেন তিন যুগ। ঠিক এমন সময় দেশ থেকে উড়ে এলেন ক্যাপ্টেনের স্ত্রী আর তাদের তিন চার বছর বয়সী ফুটফুটে এক মেয়ে। সবার মাঝে প্রাণের সঞ্চার হলো। জাহাজে বাংলাদেশ, শ্রী লংকা আর বার্মা মিলে তিন দেশি ত্রিশজন মানুষ ছিল।

১৯৯৬ সালে। মার্চের মাঝামাঝি। আমরা সিংগাপুর থেকে থাইল্যান্ড এসে এমন এক জায়গাতে নোঙ্গর করলাম যেখান থেকে ডানদিকে অনেক দূরে খুব ঝাপসা দেখা যায় শ্রীরাচা (Sriracha) নামের শহরটাকে। কখনো কখনো সেই আবছা দৃশ্যটিও দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। তখন মনে হয় যেন গভীর সাগরেই ভেসে রয়েছি। এ মুহূর্তে জাহাজে জ্বালানি তেল যা রয়েছে তা দিয়ে খুব টেনেটুনে হয়তো এক মাস চলা যেতে পারে, খাবার-দাবারের অবস্থাও অন্যথা নয়।

জাহাজ কয়েকটা দিন থেমে থাকায় আমরা অনেকেই খুব খুশি। নিত্যদিনের ক্লান্তিময় জীবনের মাঝে একটু নিঃশ্বাস ফেলার সময় জুটলে মন্দ কি!

দুই সপ্তাহ গত হওয়ার পর একটু নড়ে-চড়ে বসলাম। খবর নিয়ে জানলাম, যে কোনো সময় চার্টাররা জাহাজে এসে পড়বে আর সেই সঙ্গে শেষ হতে চলা জ্বালানী তেল, খাবার-দাবার ইত্যাদিও পৌছে যাবে। যাক, কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

এক মাস পেরিয়ে গেল। নতুন কোনো খবর নেই। কারো পকেটে পয়সাও নেই। কারণ অনেক দিন ধরে বেতন বকেয়া হয়ে রয়েছে। যেদিকে তাকাই, মনে হয় পৃথিবীর চার ভাগই জল।

নিঃসঙ্গ একটা দ্বীপের মতো পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন আমরা কতোগুলো প্রাণী। এরই মাঝে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, প্রতিদিন মাত্র এক ঘণ্টার জন্য জেনারেটর চলবে। ওইটুকু সময়ই শুধু বিদ্যুৎ আর পানি চালু থাকবে, বাকিটা সময় মৃত্যুপুরীর নীরবতা।

জাহাজ কম্পানির বাংলাদেশি মালিকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টায় জানা যায়, থাই-চার্টারের সঙ্গে তাদের আর্থিক লেনদেনগত সমস্যার কারণে এই অহেতুক জটিলতা।

বেচে থাকার মৌলিক অধিকারগুলোর ওপর নব্য আরোপিত রেশনের রুটিনে অভ্যস্ত হতে হতে দুই মাস কেটে গেল।

তিন মাসের মাথায় এক ঘণ্টার রুটিনকে ছেটে আধঘণ্টায় নামানো হলো। অনেক অনুনয়-বিনয়েও চার্টার থেকে তেল, খাবার, পয়সা কিছুই আদায় করা সম্ভব হলো না। শুরু হলো আমাদের বেচে থাকার এক নতুন সংগ্রাম। জাহাজের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কতোগুলো মূল্যবান স্টোর থাকে যেখানে জমা থাকে জাহাজ রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় সরঞ্জাম। এগুলো আমাদের বিক্রি করতে হলো একের পর এক। বিক্রির অর্থ দিয়ে অতীব জরুরি কিছু খাবার-দাবার কেনা হলো। যেহেতু বিদ্যুৎ নেই, তাই জাহাজের ডেকে ড্রাম কেটে চুলা বানানো হলো। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হলো পুরনো জমে থাকা কাঠ, বিভিন্ন আসবাবপত্র ইত্যাদি। প্রথম প্রথম এভাবে নৌবিহার স্টাইলে রান্না করার মাঝে অন্য রকম এক আনন্দ পেতাম, পরে অবশ্য চুলার ধোয়ার সঙ্গে হৃদয়ের ভাবাবেগকে দুই চোখের নোনা জলে বহুদিন বড্ড সযতনে উড়িয়ে দিয়েছি।

এরই মাঝে থাইল্যান্ডের মৎস্যকুলকে বোকা বানানোর এক অভিনব কৌশল রপ্ত করে ফেললাম। প্লাস্টিকের লম্বা সুতার মাথায় নির্দিষ্ট দূরত্বে পাচ থেকে দশটা বড়শি বাধলাম আর প্রত্যেক বড়শির গোড়ায় লাগালাম রঙ-বেরঙের পুতি। ব্যস, এতেই কম্ম সাবাড়। জলের গভীরে পুরো লাইন নামাতে না নামাতেই ওই বোকা প্রাণীগুলো পুতিকে মহামূল্যবান খাবার ভেবে অলিম্পিক স্টাইলে দিতো ছুট। নিমেষেই হাতে টান পড়তো। লাইন তুলে দেখতাম প্রায় প্রতিটি বড়শিতেই গেথে আছে বিভিন্ন সাইজের মাছ। সেগুলো ছিল আমাদের পুটি, সরপুটি এবং এর চেয়ে একটু বড় প্রজাতির অত্যন্ত সুস্বাদু ধরনের মাছ। মজার ব্যাপার হলো, এই মাছের প্রাচুর্যের কারণে সকাল, দুপুর, রাতে শুধুই হরেক রকমের মৎস্য মেনু নিয়ে গবেষণার অন্ত ছিল না।

দিনের বেলায় সময় কাটাতে আমরা সোৎসাহে তৈরি করে ফেললাম টেবিল টেনিস কোর্ট আর সুগভীর কার্গো হোল্ড (Cargo Hold)-এর ভেতরে কৃকেট পিচ। যথানিয়মে খেলাধুলায় ব্যস্ত সময় পার করতে লাগলাম। রাতে ছিল আমাদের সুবিস্তীর্ণ আড্ডাস্থ বোট ডেক (Boat Deck)-এ হারিকেনের আলোতে দাবা, লুডু ও ক্যারম খেলা।

আমাদের জীবন ধারণের মান এভাবে ক্রমেই নিম্নমুখী হয়ে চলছিল। অনুভব করতে পেরেছিলাম, মালিক হয়তো আমাদের পরিত্যাগ করতে পারে আর চার্টারের রহস্যময় শীতল আচরণ ছিল বর্ণনাতীত। তাই আমরা ব্যাংকক ভিত্তিক বিভিন্ন আন্তর্জতিক নৌ ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম চার মাসের মাথায়। কেউ এগিয়ে এলো না। একমাত্র শেষ ভরসা ছিল ব্যাংককের বাংলাদেশ দূতাবাস। সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছি তাদের নীরব ও শীতল আচরণে। জানি না বহির্বিশ্বে আমাদের দূতাবাসগুলো কার স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে!

প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙে এক বুক আশা নিয়ে, নতুন কিছু শুনবো বলে, নতুন কিছু দেখবো ভেবে। পরক্ষণেই আরো বেশি তলিয়ে যাই হতাশার অন্ধকারে। নীরব–নিথর হয়ে প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে ভেসে থাকা জাহাজের বারান্দায় বসে শ্রীরাচা–র বিষণ্ন হওয়ার বুকে কান পেতে থাকি জীবনের হারিয়ে যাওয়া ঝংকারের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়ার আকুলতায়। দৃষ্টিকে প্রসারিত করি দিগন্তের যায় হয়তো দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে কিছু দেখতে চাওয়ার এক অপ্রতিরোধ্য বাসনা নিয়ে। একটু একটু করে নিঃশেষিত হতে হতে হৃদয়ের গভীরে যে সত্যকে আবিষ্কার করেছি তা হলো, মানুষের জীবনে বেচে থাকার একমাত্র অমূল্য উপকরণ হলো আশা।

প্রায় ছয় মাস কেটে গেছে। হঠাৎ একদিন শুনলাম, চার্টার আমাদের কিছু তেল, পানি আর দুতিন বস্তা চাল–জল পাঠাবে। শুরু হলো প্রতীক্ষার পালা। জীবনে কখনো ভাবিনি এক তুচ্ছাতিতুচ্ছ ডিজেল অয়েলের জন্য তীর্থের কাকের মতো পথ চেয়ে বসে থাকতে হবে। দুই সপ্তাহ পর সত্যিই এলো ছোট্ট কয়েক ড্রাম তেল আর চাল, জল, পানি। অনেক দিন পর আবার জেনারেটর চললো আধঘণ্টার জন্য। ক্ষণিকের তরে জাহাজে প্রাণের হাওয়া বইলো। আমাদের শুকিয়ে যাওয়া বিষণ্ন চেহারাগুলোতে ক্ষণস্থায়ী হাসির ঝিলিক দেখা দিল।

এরই মাঝে খবর এলো বাংলাদেশি মালিক জাহাজকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে। সেই সঙ্গে তার ত্রিশজন মানুষকেও।

এবার শুরু হলো থাই চার্টারের নতুন খেলা। সে বিভিন্ন পার্টির কাছে জাহাজ বিক্রির চেষ্টা চালাতে লাগলো। মানবেতর জীবনের মাঝে বেচে থাকা আমরা যে কোনো শর্তে এই অসহনীয় বন্দিদশা থেকে মুক্তি চাইলাম। গত সুদীর্ঘ সাড়ে ছয় মাসে আমাদের কারোরই দেশের পরিবার–পরিজনের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ মেলেনি। উদাসী মনের আঙিনায় দুর্ভাবনা বাসা বাধে, এ জীবনে হয়তো প্রাণপ্রিয় মুখগুলোকে আর দেখতেই পাবো না। একদিন নিভে যাবে জীবন প্রদীপ, জানবে না কেউ কোনোদিন।

এখন আর খেলি না, মাছ ধরার আগ্রহও মরে গেছে। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকি একে অপরের মুখে, অনুভূতি ও বোধ–শক্তিহীন জড় পদার্থের মতো। একে অন্যকে সান্ত্বনা দেয়ার নিষ্ফল চেষ্টা মাত্র, নিজের সঙ্গেই নিজের অভিনয়।

সপ্তম মাসের গোড়ায় থাই চার্টার নিয়ে এলো এক ভিনদেশি মাফিয়া জাহাজ ব্যবসায়ীকে। তার কাজই ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সমস্যায় নিপতিত জাহাজের পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে একদম নামমাত্র দামে জাহাজ হস্তগত করা। এটা হলো জাহাজ ব্যবসার এক ভয়ংকর কালো অধ্যায়। মাফিয়া ওই চার্টারের মারফত আমাদের সঙ্গে একটা নিগোসিয়েশনে পৌছাবার চেষ্টা করলো। আমাদের প্রস্তাব ছিল সমস্ত বকেয়া বেতন পরিশোধ করে সবাইকে দেশে ফেরত পাঠালেই হবে। মাফিয়া কোনো মতেই মোট বেতনের ৬০ শতাংশের বেশি দিতে নারাজ। আমরা পর্যায়ক্রমে ৯০ শতাংশ, ৮০ শতাংশ, অবশেষে ৭০ শতাংশে নামলাম। কাজ হলো না। জাহাজে এ নিয়ে শুরু হলো মিশ্র প্রতিক্রিয়া। একবেলা, আধাবেলা খেয়ে জীবনকে আর কতোটা টেনে নেয়া সম্ভব হবে তা নিয়ে সংশয় ছিল।

যখন আট মাস শেষ হলো তখন একদিন ওই ইহুদি মাফিয়ার নগ্ন ভয়ংকর চেহারা দেখলাম। সে বললো, আমরা যদি ভালোয় ভালোয় ৬৫ শতাংশকে স্থির না হই তবে আমাদের ভাগ্যে চরম কিছু ঘটা মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। খুবই শংকিত হলাম। জীবনের মায়ার কাছে অর্থের কোনো মাত্রা থাকে না।

১৯৯৬ সাল। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ। মাফিয়ার হাতে আমরা পুরোপুরি সমর্পিত। মুহূর্তের ভেতরে কাহিনী বদলে যেতে শুরু করলো। মাফিয়া তার অপর এক জাহাজকে আমাদের জাহাজের পাশে ভেড়ালো। তার নিজস্ব লোকজন এসে আমাদের জাহাজের দখল নিয়ে নিল। আমরা হয়ে গেলাম জাহাজের যাত্রী। অনেকটা নিজভূমে পরবাসী। যথানিয়মে আমাদের ৬৫ শতাংশ দেয়া হলো, শ শ টন তেল আর পানি এলো। এলো প্রচুর খাবার–দাবার। লাগেজ বেধে প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

২৮ নভেম্বর বিকেলবেলা মুক্তির সেই কাঙ্ক্ষিত লগ্ন। একে একে সকলে স্পিডবোটে গিয়ে উঠলাম। পেছন ফিরে তাকাতেই চোখে পড়লো অদ্ভুত সুন্দর নীলরঙা সেই জাহাজটা যার সঙ্গে মিশে আছে আনন্দ–বেদনার হাজারো স্মৃতি। সানগ্লাসে চোখ ঢেকে এগিয়ে চললাম শ্রীরাচা শহর অভিমুখে। আমার দেশের অবিবেচক মালিকের কয়েক কোটি টাকার সম্পদ অন্যের হাতে তুলে দিয়ে।

তারপর। সময় গড়িয়ে গেছে তার নিজস্ব ধারায়। মহাসাগরীয় স্রোতেরা দিকভিন্ন হয়েছে অসংখ্যবার। প্রতিজ্ঞা করেছি ফিরে যাবো না সাগরে আর কোনোদিন। কিন্তু নোনা জলের আহ্বান গভীর মায়ার জালে জড়িয়েছে আমায় বারে বারে। এ কয় বছরে পৃথিবীর জাহাজ ব্যবসায় সূচিত হয়েছে বিশাল সব পরিবর্তন। অত্যন্ত আধুনিক ভিন দেশীয় জাহাজগুলোতে আজ কমপিউটারের সঙ্গে কমপিউটারের মতোই ঘড়ির কাটার সেকেন্ড মেপে মেপে ভেসে চলি, একটু থেকে গিয়ে নোনা জলের মাঝে আটকে পড়া সেই সব সাড়ে আট মাসের দিন–রাতগুলোর কথা ভাবার অবকাশ কোথায়?

WPA, সিঙ্গাপুর থেকে
ifti02bd@yahoo.com

রেস্টরুমে রেস্ট নিন

– সাব্বির সারোয়ার আহমদ

রেস্টরুম (Restroom - সর্বসাধারণের জন্য নির্মিত পায়খানা। *মানুষ এবং পশুর মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি? মানুষ রেস্টরুম ব্যবহার করে। কিন্তু পশু করে না* – বাণী চিরন্তনী (স্বউদ্যোগে প্রকাশিতব্য)।

অবশ্য পাখিও এটা ব্যবহার করে না। কিন্তু বাণী হলো বাণী। এটা নিয়ে প্রশ্ন থাকা উচিত নয়। শিক্ষিত পশু বা পাখির ক্ষেত্র ছাড়া মানুষ হলো একমাত্র প্রাণী যারা বর্জ্য ত্যাগের ক্ষেত্রে শালীনতা বজায় রাখে।

রেস্টরুম নিয়ে কিছু লেখা বা পড়া অনেকের ক্ষেত্রে বমনের ইচ্ছা জাগাতে পারে। কিন্তু সম্পাদকের উচিত এটা বিবেচনা করা, সামনে *ঈদ* এবং এ সময় রেস্টরুমের ব্যবহার বেশি হবে। তাই রেস্টরুম বিষয়ক যে কোনো গদ্য সাধনা ঈদ সংখ্যায় অন্তত প্রকাশযোগ্য।

রাস্তার উভয় পাশের মাঠে মল ত্যাগকারীতে পরিপূর্ণ। অনেকের মুখ আমাদের দিকে। তাদের লিঙ্গ দুই পায়ের ফাক দিয়ে ঝুলছে। অন্যেরা পেছন ফিরে বসেছে, তাদের নিতম্ব আমাদের চোখে পড়ছে মলের পিরামিডের এক ইঞ্চি উপরে। ইনডিয়ান চাষীরা মল ত্যাগের ক্ষেত্রে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। (দিল্লি, খুশবন্ত সিং, আনোয়ার হোসেইন মঞ্জুকৃত অনুবাদ)।

আরেক কৃতী ইনডিয়ান চিদানন্দ দাশগুপ্ত (চলচ্চিত্র সমালোচক, অপর্ণা সেনের পিতা) তার এক লেখায় পশ্চিম ইনডিয়ান কোনো রাজ্য ভ্রমণকালে অনুরূপ দৃশ্য দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইনডিয়ার সাংস্কৃতিক অবনমন দিয়ে ক্ষোভ ঝেড়েছিলেন। আসলেই কোনো এলাকায় পর্যাপ্ত রেস্টরুমের অভাব থাকলে এমন দৃশ্য চোখে পড়তেই পারে।

আমাদের দেশে পর্যাপ্ত গণশৌচাগার আছে এ দাবি কারো করা উচিত হবে না। বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষ সময়ে সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়ে। তবে সত্যি কথা বলতে কি দিনের আলোয় আমাদের দেশের

লোকদের নিতম্ব প্রকাশে লজ্জাবোধ আছে। অন্তত রাস্তাঘাটে আমরা উদোম নিতম্ব দেখি না। আমাদের গর্ব করার মতো বিষয়ের ক্ষুদ্র তালিকাতে এটা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার।

তবে একটা কাব্যিক শিরোনামের জন্য রেস্টরুমের উল্লেখ করলেও আমার লেখার বিষয়বস্তু শুধু রেস্টরুম তথা গণশৌচাগার নয় বরং সাধারণ শৌচাগার তথা টয়লেটও এর অন্তর্গত। এলাকা ভেদে যার ভিন্ন নাম আছে, এমনকি সময়ের সঙ্গেও এর পরিবর্তন হয়েছে। টাট্টিখানা থেকে পায়খানা, পায়খানা থেকে বর্তমানের টয়লেট। টয়লেটে যেহেতু বাথরুমে থাকে, তাই আজকালকার অ্যাপার্টমেন্ট কালচারে আমরা বাথরুম বলেই চালিয়ে দিই। এমনকি টয়লেটে যে ক্রিয়া সাধিত হয় তার চলতি নামও বাথরুম করা।

বেশিদিন আগের কথা নয়, আমরা যত্রতত্র ঝুলন্ত পায়খানা দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। সাধারণত এগুলো ছিল কোনো পুকুর বা নদীর ধারে। এগুলো আসলেই ছিল ঝুলন্ত। শুধু এর ওপর আরোহণ করলেই নয়, সামান্য বাতাসেই এগুলো দুলতো। বৈশিষ্ট অনুসারে নামকরণ ছিল যথার্থ।

এখনো বস্তিগুলোতে বা গ্রামের দিকে গেলে এগুলো দেখবেন। তবে স্যানিটেশনে বাংলাদেশ আক্ষরিক অর্থেই অনেক এগিয়েছে। সময় শুধু ভালো জিনিসই কেড়ে নেয় না, বরং ঝুলন্ত পায়খানার মতো জিনিস নিয়েও যায়।

সারা দিন আপনি কতোটা সময় রেস্টরুম ব্যয় করেন? আমাদের দেশের মানুষদের ওপর এ ধরনের কোনো পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই। পেট নামা বা ডায়ারিয়া অথবা আমাশয়ের মতো উদরাময় (উদরের ব্যাধি) বাদ দিলেও একটা উল্লেখযোগ্য সময় আমরা সেখানে কাটাই। কিন্তু বাড়ির অন্যান্য ঘরের মতো এই বিশেষ ঘরটির কি যত্ন আমরা নিই? ভুল বুঝবেন না। আমি কোনো টয়লেট ক্লিনারের বিজ্ঞাপক নই। তবুও বলবো, এটার যথাযথ যত্ন নেয়া উচিত। যে বর্জ্য আপনি ত্যাগ করছেন তা যেন অন্যের বর্জ্য ত্যাগে কোনো বিঘ্ন না ঘটায় সেটা আপনার দেখা উচিত। দুর্গন্ধ এবং জীবাণুর কথা বাদ দিলাম।

পরিচ্ছন্ন এবং দুর্গন্ধমুক্ত টয়লেট ব্যবহার করুন। যে সময়টা আপনি হাতে পাচ্ছেন তার যথাযথ ব্যবহার করুন। মনকে প্রশান্ত করুন। রেস্টরুম নামটা এমনি এমনি আসেনি। রেস্টরুমে রেস্টই নিন। পরিধেয় বস্ত্র থেকে অবমুক্ত হোন এবং বর্জ্য ত্যাগ করুন প্রশান্ত মনে।

রাজশাহী থেকে

sabbirsahmad@gmail.com

ট্রেসি

– জিয়াউল হক

Have you ever been lonely, have you ever been blue.
Have you ever loved someone, as much as I love you ...!
কখনো কি তুমি হয়েছো একা? হয়েছো কি কখনো বেদনায় নীল?
এতোটা ভালো কি বেসেছো কাউকে, যতোটা তোমাতে আমি হয়েছি লীন!

আমি কবি নই আর আমার এমন দক্ষতাও নেই যে আমি ভিন্ন ভাষায় একটি গান বা কবিতাকে তার ভাব ও মর্মার্থ ঠিক করেই অনুবাদ করে সুধী পাঠকের সামনে তা উপস্থাপন করবো। তারপরেও সাহস করে উপরের অনুবাদটুকু করলাম। ভুল হলে আমার বিশ্বাস পাঠক তা ক্ষমা করে দেবেন।

গান শোনার সময়-সুযোগ আমার খুবই কম, যদিও তা উপভোগ করি। তালাত মাহমুদ-এর পুরনো দিনের গান, সোহরাব হোসেন-এর গলায় নজরুল সংগীত, কাদেরী কিবরিয়ার গলায় রবীন্দ্র সংগীত, উর্দু ভাষায় আহমেদ রুশদির গজল, আব্বাসউদ্দীন-এর ভাটিয়ালি, সাইফুল্লাহ মানসুরের অথবা মতিউর রহমান মল্লিকভাই-এর গাওয়া গান শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকি। কিন্তু বড়ই বদনসিব আমার, সে সময় হয় না।

উপরের আলোচ্য সংগীতটি একটি ইংরেজি গানের দুটি চরণ এবং তার বাংলা অনুবাদ। এটি আমার প্রিয় সংগীত, তা নয়। তবুও সেটিই আলোচনায় আনলাম এই জন্য, এটি শুধু একটি সংগীতই নয়, বরং এটি একটি

আয়না যার মধ্যে দিয়ে এই বৃটেনে বসবাস করার পাশাপাশি তাদের সমাজ ব্যবস্থা ও জীবন পদ্ধতিকে দেখেছি গভীরভাবে। বিষয়টি পাঠকের দরবারে হাজির করলাম এই আশায় পাঠকও হয়তো তার কিছুটা আন্দাজ করে নিতে পারবেন। আলোচ্য গানটি চল্লিশ ও পঞ্চাশ–এর দশকে ইংল্যান্ডে অত্যন্ত জনপ্রিয় গানগুলোর একটি, এখনো এ গানটি অনেককেই ভাবাবেগে আপ্লুত করে দেয়, তা নিজের চোখেই দেখেছি। গানটি প্রথম শুনি আমার কর্মস্থলে তিরাশি বছর বয়স্কা এক বৃদ্ধার কাছে।

এ ঘটনাটি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিতান্তই প্রয়োজনের খাতিরে শুধু এতোটুকু বলে রাখি, আমি এই ইংল্যান্ডে পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট একটি বেসরকারি মেন্টাল হাসপাতাল বা নার্সিং হোম–এ ডেপুটি ম্যানেজার পদে কর্মরত। আমার স্পেশালাইজেশন সাবজেক্ট হলো মানসিক অসুস্থতা ও সেই সংক্রান্ত নার্সিং। আর আমার এই হোমে বা হাসপাতালে যারা বাস করেন তাদের সকলেরই বয়স হলো পয়ষট্টি বা তার উপরে। এখানে পয়ষট্টি থেকে শুরু করে ছিয়ানব্বই বছর পর্যন্ত বয়সের রোগী আছে। এই হাসপাতালটি বিশেষভাবে ডিমেনশিয়া চিকিৎসা ও তার ব্যবস্থাপনার জন্যই নির্ধারিত। এখানে যারা একবার ভর্তি হন তাদের বেরুনোর পথ থাকে না। তারা যেহেতু তাদের বার্ধক্যে পৌছেছেন, তাদের সন্তানসন্ততি (যদি ততোদিনে কারো কোনো ছেলে মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে থাকে!) কেউই তাদের যত্ন বা দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নয়। এখানে খরচেরও ব্যাপার আছে। কারণ তারা তো রিটায়ার করেছেন। এ বয়সে কোনো কাজ করে খেতে পারেন না। তাই সরকার তাদের ভরণ–পোষণসহ চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে থাকে। সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ই ঠিক করে দেয়, কাকে কখন এইসব হাসপাতালে যেতে হবে। একবার এলে তাদের আর কোনো পথ থাকে না এখান থেকে বেরিয়ে নিজ বাড়ি ফিরে যাওয়ার। জীবনের বাকি দিনগুলো তাদের অতি অবশ্যই হাসপাতাল রূপী এই সব নার্সিং হোমেই কাটিয়ে দিতে হবে। এমন লোকও দেখেছি যারা এভাবে প্রায় তেইশ বছর ধরে পড়ে আছে। এ যে কতো বড় বেদনাদায়ক ও বুকের পাজর চুরমার করার মতো দৃশ্য তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সত্যিই খুবই কঠিন।

যাহোক। আমি আজ যার কথা বলবো তিনি হলেন তিরাশি বছর বয়স্কা ট্রেসি হারপার। বৃটেনে ডাটা প্রটেকশন অ্যাক্ট–এর কারণে মূল নামটি বদলে দিলাম। তাকে দেখেই বোঝা যায়, ভদ্রমহিলা তার যৌবনে ছিলেন অতীব সুন্দরী, বলা চলে অনিন্দ্য সুন্দর। এ ট্রেসির কাছেই প্রথম শুনেছিলাম গানটি। বুড়ি তার দুর্বল পা ফেলে বারান্দার রেলিং ধরে সারা ফ্লোর ঘুরে বেড়াবেন তার হাতের লাঠিটি ভর করে। যতোক্ষণ না তিনি ক্লান্ত হচ্ছেন ততোক্ষণ তার এই পদযাত্রা চালু থাকবে। তার যত্ন নেয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত কেয়ার অ্যাসিসটান্ট এবং নার্সরা সারা দিন ধরে তাকে চোখে চোখে রেখে চলা সত্ত্বেও তিনি প্রায় প্রতিদিন না হলেও, প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুই একবার আছাড় খাচ্ছেনই। যেহেতু ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রষ্ট রোগে ভুগছেন, তাই তার কোনো ধারণাও থাকে না গতকাল কি ঘটেছে। রোগের ব্যাপকতা অনুযায়ী তাদের ধারণাও থাকে না, তারা কোথায় আছেন বা তারাই বা কে?

আমার নিয়মিত প্রাত্যহিক দুবার ফ্লোর রাউন্ডে প্রায়ই তাকে দেখতে পাই, তিনি ওই একই গান গেয়ে খুব ধীর পায়ে হেটে যাচ্ছেন। কখনো তার পাশ দিয়ে যেতে যেতেই তার মাথার ওপর আলতোভাবে হাতটি বুলিয়ে দিই। বলি, হ্যালো ট্রেসি, সাবধানে যাও, দেখো পড়ে যেও না যেন।

আমার বড় মায়া হতো তাকে দেখে, তাদের একাকীত্ব আর নিসঙ্গতা দেখে বড়ই বেদনা অনুভব করতাম। এ বেদনাই আমাকে আরো বেশি জানার জন্য উদগ্রীব করে তুলেছে। আমার সমস্ত উৎসাহ ও আবেগ নিয়ে ভাবতাম। আমার মায়ের চেয়েও বেশি বয়সের এই বৃদ্ধার সকল আচার–আচরণ, কর্মকাণ্ড দেখতাম। এভাবেই তাকে চিনেছি, জেনেছি। আজ মনে হয়, হায়! যদি তাকে না জানতাম তাহলেই বোধহয় এক অব্যক্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকতে পারতাম।

সময়ের পরিক্রমায় ট্রেসির শরীর দুর্বল হতে থাকেন তার ডিমেনশিয়া বেড়ে যেতে থাকার পাশাপাশি। এ রোগটিকে যারা জানেন না তাদের পক্ষে এটি বোঝা খুবই কঠিন যে, এ রোগটি কি ভয়ংকরভাবে একজন মানুষকে পঙ্গু করে দেয়। এক সময় তিনি শয্যাশায়ী হয়ে যান। চব্বিশটি ঘণ্টাই কাটে বিছানায়। খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে যাবতীয় কিছুই বিছানায় এবং তা তার জন্য করে দেয় তার নির্ধারিত কেয়ার অ্যাসিসটান্টরা নার্সদের তৈরি করে দেয়া কেয়ার প্ল্যান অনুযায়ী।

গত ডিসেম্বরে এখানে যখন প্রচণ্ড শীত, বাইরে বরফ পড়ছে এমন আবহাওয়ায় ট্রেসি প্রথমে ফ্লু জাতীয় জ্বরে আক্রান্ত হলেন এবং মাত্র তিন চার দিনের মধ্যেই তার অবস্থার অবনতি হলো।

ইতিমধ্যে তার কনসালটেন্ট দুই দুবার তাকে দেখে গেছেন এবং সর্বশেষবারে তার অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের দেশের ভাষায় শেষ কথাটি বলে গেছেন।

প্রতিদিনই সকালে আমার অফিসে বসেই অন্য রোগীদের মতো তার সর্বশেষ অবস্থা জানিয়ে তৈরি করা রিপোর্ট পাই। এরই অংশ হিসেবে একদিন এ রকম এক রিপোর্ট পেয়েই মনটি খারাপ হয়ে গেল। ফ্লোর নার্সকে ডেকে নিয়মানুযায়ী ট্রেসির নেক্সট অফ কিন (Next of kin)-কে ডেকে অথবা ফোনে তার এই সর্বশেষ অবস্থাটি জানিয়ে দিতে বললাম এবং তারা চাইলে পাদরিকে ডেকে এখানকার নিয়মানুযায়ী বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করার কথাও বলে দিলাম।

কিন্তু নাইজেরিয়ান নার্স ভদ্রমহিলা আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, তিনি গত আট বছর ধরে এ মহিলাকে জানেন এবং তার জানা মতে, এই আট বছরে একটিবারের জন্যও তাকে কেউ দেখতে আসেনি এবং তার নিকটাত্মীয় কেউ আছেন বলে তিনি জানেন না।

শুনে আমার মনটা কেমন যেন দুমড়ে-মুচড়ে গেল। তাকে বলে দিলাম তার সোশাল ওয়ার্কারের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করার জন্য।

সেদিন বিকেল পর্যন্ত কোনো খবর না পেয়ে দিন শেষে অফিস থেকে বেরিয়ে আসার আগে নিজেই তার সোশাল ওয়ার্কারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলাম।

ভদ্রমহিলা যা বললেন তার সারাংশ হলো, তার কমপিউটার রেকর্ড অনুযায়ী ট্রেসির এক ছেলে আছে, নাম মার্টিন। এর আগে সে মাঝে মধ্যে তার মায়ের খোজ নিতে আসতো। এ রকম সর্বশেষ সে এসেছিল ১৯৮৯ সালে! এরপরে সে আর আসেনি। তবে সেই ছেলে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত মাঝে মধ্যে ফোন করে তার মায়ের খবর নিতো। কিন্তু গত প্রায় নয়টি বছর সে আর কোনোদিন ফোনও করেনি।

যেন অসার হয়ে তার কথা শুনছিলাম।

আমার পক্ষ থেকে অনেকক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ওই সোশাল ওয়ার্কার বোধহয় ভেবেছিলেন, আমি এ প্রান্তে লাইনে আছি কি নেই। তাই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আর ইউ উইথ মি? (তুমি কি আমার কথা শুনছো)।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে বললাম, হ্যা, তোমার কথা শুনছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমাদের দেশে আমি নতুন। এরকম ঘটনা আমার জীবনে নতুন।

তিনি বললেন, তাই তোমার বোধহয় খারাপ লাগছে। কিন্তু আমাদের সয়ে গেছে।

ট্রেসির মুমূর্ষু অবস্থা জানিয়ে তাকে অনুরোধ করলাম, তুমি কি কোনোভাবে মার্টিনের কোনো খবর বের করতে দিতে পারো? আমি কি তোমাকে এই পার্সোনাল রিকোয়েস্টটা করতে পারি?

ভদ্রমহিলা আমাকে কথা দিলেন, তিনি আগামীকাল অফিসে এসেই মার্টিনের পুরনো রেকর্ড ও সোশাল সার্ভিসের সহায়তা নিয়ে খোজ করে আমাকে জানাবেন।

অফিস থেকে বেরিয়ে আসার আগে একবার ট্রেসির রুমে গিয়ে তাকে দেখে এলাম। অজ্ঞান অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছেন, বড় মায়াবী মুখ। প্রায় সোয়া বছর ধরে না দেখা আমার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। বেরিয়ে এসে বাড়ির পথ ধরলাম।

পরদিন সকালে অফিসে গিয়ে বসেছি। প্রতিদিনকার মতো এক কাপ চা বানিয়ে নেয়ার আগে টেবিলে পড়ে থাকা ফাইলটি টেনে নিয়ে দেখে নিলাম রিপোর্টটি। না, ট্রেসি এখনো মারা যায়নি। তবে তার অবস্থা এতোটাই খারাপ, আজকের দিনটি পার করতে পারবে কি না সে বিষয়েই তাদের সন্দেহ আছে। এভাবেই আমার ব্যস্ততার মাঝে বেলা প্রায় এগারোটা বেজে গেল।

এক সময় সেই সোশাল ওয়ার্কারের ফোন পেলাম। তিনি জানালেন, সোশাল সার্ভিস ও লোকাল কাউন্সিল-এর মাধ্যমে তিনি খোজ পেয়েছেন, মার্টিন আজ থেকে প্রায় সাত আট বছর আগে তার গার্ল ফ্রেন্ডসহ জিব্রল্টার-এ গিয়ে বসবাস করছেন। তিনি আশা করছেন, আজ বিকেলের মধ্যেই তিনি লোকাল সিটি কাউন্সিলের মাধ্যমে মার্টিনের কন্টাক্ট নাম্বার পেয়ে যাবেন এবং পেলেই আমাকে জানাবেন।

তাকে শুধু বললাম, তোমাকে ধন্যবাদ এতোটুকু করার জন্য। তবে ট্রেসি আজ বিকেল পর্যন্ত যদি টিকে থাকে তবে আমরা আশ্চর্যই হবো।

বিকেল সাড়ে তিনটা। বিকেল না বলে বরং বলি রাত, কারণ এই বৃটেনে ডিসেম্বর মাসে এ সময়টায় রাত হয়ে যায়। আমার অফিসে বসে কিছুক্ষণ আগে মারা যাওয়া ট্রেসির ফাইল যা একটু আগে আমাকে ফ্লোর নার্স দিয়ে গেছে সেটা দেখছিলাম। একটু আগেই ই-মেইলে এ খবরটি জানিয়ে দিয়েছি হেড অফিসে। হঠাৎ করে কমপিউটার স্ক্রনে নজর পড়লো। ব্লিপ করে কমপিউটার জানাচ্ছে নতুন একটি ই-মেইল আছে।

তাড়াতাড়ি তা পড়লাম। ভেবেছিলাম হেড অফিস থেকে এসেছে। কিন্তু না, তা এসেছে জিব্রল্টার থেকে, মার্টিন হারপার তার মা মিসেস ট্রেসি হারপার-এর খবর জানতে চেয়েছে।

তৎক্ষণাৎ ফিরতি ই-মেইলেই তাকে তার মায়ের দুঃখজনক মৃত্যুর খবরটি জানালাম।

মাত্র দশ বা পনেরো মিনিটের মাথায় টেলিফোন পেলাম সেই সুদূর জিব্রল্টার থেকে মি. মার্টিনের। বললেন, তিনি তার মায়ের মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছেন। তার মা একজন অতি মহীয়সী নারী ছিলেন। তার শেষ দিনগুলোতে আমাদের হাসপাতাল তার সেবা চিকিৎসা দিয়েছে তার জন্য আমাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিফোন রাখলেন।

টেলিফোনের রিসিভার রেখেই আমার মোবাইল ফোনটি হাতে তুলে নিলাম, নাম্বার ডায়াল করে একটু অপেক্ষা করতেই অপর প্রান্তে ভেসে উঠলো যার গলা তিনি আমার মমতাময়ী মা। আমার জান্নাত।

ইংল্যান্ড থেকে

abuarif@yahoo.com

ঝগড়া

– সৌমন্ত

অনেক দিন পর বাড়ি যাচ্ছি। বিকেলেই দুটো টিকেট করে ফেললাম। সকাল সাতটায় গাড়ি। খুব ভোরে উঠতে হবে। যতো তাড়াতাড়িই ঘুমাই না কেন, ভোরে ওঠাটা আমার একটু সমস্যা। ভোরবেলার ঘুমটাই বেশি গাঢ় হয়। বিছানা থেকে একদম উঠতে ইচ্ছা করে না।

সন্ধ্যার সময় শ্রাবন্তীর ফোন। হ্যালো বলতেই কান্নার শব্দ। কাদতে কাদতে বললো, তুমি কোথায়?

কিছুটা রাগত স্বরে বললাম, কেন?

তুমি কাল সকালে ক্যাম্পাসে এসো প্লিজ।

আমি তো কাল গোপালগঞ্জ যাচ্ছি।

একদিন পরে গেলে কি হয়?

দেখো, আমি টিকেট করে ফেলেছি। তাছাড়া আমার সঙ্গে বিপাশাও যাবে।

আজ দুপুরে শ্রাবন্তীকে একটা চিঠি দিয়েছি। লিখেছি, আজ থেকে আমাদের সব সম্পর্ক শেষ আর রিলেশন কনটিনিউ করবো না। ওর এক বান্ধবীকে দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। হাতে পাওয়া মাত্রই ফোন করেছে। এতো রাগ লাগছিল, রিলেশন নষ্ট করার সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেললাম। কিন্তু ওর কান্না বরাবরের মতো এবারও দুর্বল করে দিল।

শ্রাবন্তী ওপাশ থেকে বললো, তুমি এসব কি লিখেছো?

আমার রাগ তখনো কমেনি। বললাম, কি লিখেছি পড়োনি?

কেন লিখেছো?

তুমি কেন বললে, *যা করেছি, করেছি।* এখন কি প্রেম করবে না?

এটা তো রাগের মাথায় বলেছি। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করোনি, তাই।

রাগ শুধু তোমার থাকবে, আমার থাকবে না?

আচ্ছা, এটা নিয়ে কাল ঝগড়া করো, এখন বলো কাল আসবে?

বোকার মতো কথা বলো না, কাল আমাকে যেতেই হবে।

প্লিজ।

এখন কি করি? বললাম, আচ্ছা, এখন আসি?

ও একটু রেগে বললো, লাগবে না।

আমিও বললাম, আচ্ছা।

ফোনের লাইনটা কেটে দিলাম।

এখন ওর বাসায় গেলেও ফিরতে পারবো না। অনেক রাত হয়ে যাবে। না, এখন আর যাবো না।

দশটার সময় আবারও ফোন। তুমি আসলে না কেন?

তুমিই তো নিষেধ করলে।

ও।

আচ্ছা, বাড়ি থেকে আসি, তখন দেখা করবো।

কবে আসবে?

তিন দিন পর।

তুমি এমন চিঠি কেন লিখলে?

আসি তারপর বলবো।

আমাকে এখন ভালো লাগে না, না?

ভালো না লাগলে প্রেম করেছি কেন? বললাম, শোনো, কান্নাকাটি বন্ধ করো। আসি তারপর কথা বলবো। এখন রাখি।

প্রেম নিয়ে বহু সমস্যায় আছি। দুই দিন পর পর ঝগড়া হয়। কি যে করি? আগেই ভালো ছিলাম। ইচ্ছা মতো যা খুশি তা করতাম। বিয়ের আগেই এতো নিষেধাজ্ঞা ভালো লাগে না। কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলা যাবে না, কারো রূপের প্রশংসা করা যাবে না, সিগারেট খাওয়া যাবে না, সময় মতো দেখা করতে হবে। একটু লেট হলেই ঝগড়া শুরু। বেচারী নিশ্চয়ই সারা রাত কাদবে। এসব চিন্তা।

রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছি! কি করা যায়? শ্রাবন্তী আমাকে খুব ভালোবাসে। তাই অল্পতেই রেগে যায়।

আমিও ভালোবাসি প্রচণ্ড। তাই কোনো ছেলের সঙ্গে ওকে দেখলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

শ্রাবন্তী আমার দূরসম্পর্কের বোন। ছোটবেলা থেকে আমরা খুব ভালো বন্ধু। খুব মারামারি করতাম আগে। কবে যে প্রেম হয়ে গেল বুঝতে পারিনি। আমি দুই বছরের সিনিয়র। সে ইকনমিক্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। আমি

ফিজিক্সে থার্ড ইয়ারে। আগে দেখা করতে খুব সমস্যা হতো। হয়তো মাসে একবার। সারা দিন এক সঙ্গে ঘুরে সন্ধ্যায় বাসায় পৌছে দিতাম। এখন প্রতিদিনই ক্যাম্পাসে দেখা হয়। যদিও ওর ডিপার্টমেন্ট থেকে আমার হল বেশ দূরে। কিন্তু ও একবার আসবেই।

সেদিন দেখি একটা ছেলে ওর হাত ধরে টানছে। সঙ্গে অন্য বন্ধুরা। আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। বিকেলে বললাম, ভালোই তো হাত ধরাধরি করলে।

কখন?

সকালে টিএসসিতে।

শ্রাবন্তী আত্মসমর্পণ করলো। বললো, আমি তো ধরিনি।

বললাম, নিশ্চয়ই তোমারও সমর্থন ছিল। নইলে সাহস পায় কি করে?

শ্রাবন্তী হুট করে রেগে গেল, তোমার তাই মনে হয়। আচ্ছা, প্রেম করবে না আর।

ইচ্ছা করছিল ঠাস করে একটা চড় মারি। বহু কষ্টে সামলে নিলাম। এরপর লিখেছি চিঠিটা।

বাড়ি যাওয়ার পথে লঞ্চে খুব একা লাগছিল। যদিও আমার বোন বিপাশাও আছে। তবুও খারাপ লাগলো। লঞ্চের ছাদে বসে ঢেউ দেখছি। ভাবছি কি করবো। এখনো রাগ কমেনি। কিন্তু ওর কান্না মাখা মুখটার জন্য কষ্ট হচ্ছিল। কবে যে এতো ভালোবেসে ফেললাম!

বাড়িতে আব্বা-মাকে দেখে ভালো লাগলো। শৈশবের বেড়ে ওঠার জায়গাগুলো নিয়ে খুব মায়া আমার। এখানকার গাছপালা দীর্ঘ দিন না দেখলে কষ্ট হয়।

এ মফস্বলেই বড় হয়েছি আর শ্রাবন্তী ঢাকায়। ঢাকায় প্রায়ই যেতাম। পার্মানেন্টলি ঢাকায় এসেছি পরীক্ষার পর। থাকি ইউনিভার্সিটির হলে। অনেক দিন পর বাড়ি এলে খুব ভালো লাগে। কিন্তু এবার লাগছে না। শ্রাবন্তীকে দেখতে ইচ্ছা করছে। তবে এটাও ঠিক, কান্নাকাটি না করলে জীবনে আর দেখা করতাম না।

পরদিন সকালে আবার ফোন করলো। আহ্লাদের সুরে বললো, কি করছো তুমি?

ফোনে কথা বলছি।

কার সঙ্গে?

একটা ঝগড়াটে মেয়ের সঙ্গে।

আমি ঝগড়াটে?

না না, তুমি তো মাদার টেরেসা।

তাই-ই?

হ্যা হ্যা, ভালো না বললে তো আবার ঝগড়া করবে।

করলে করবো। তুমি পচা চিঠি কেন লিখলে?

তুমি পচা কথা বললে, তাই লিখলাম।

জানো কাল সারা রাত ঘুমাইনি তোমার জন্য।

কেন? আমি কি তোমার গায়ের ওপর শুয়ে ছিলাম নাকি?

তুমি কবে আসবে? আমাকে ছাড়া কিভাবে আছো? সারা জীবন থাকতে পারবে?

আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না। বললাম, তোমাকে ছাড়া কার সঙ্গে ঝগড়া করবো বলো!

তিনটা দিন খুব কষ্টে কাটলো। চলেও আসতে পারি না। এতো দিন পর বাড়ি গিয়েছি। আব্বা-মা মন খারাপ করবেন।

ঢাকায় পৌছালাম রাত দশটায়। সাতটার সময় সে ফোন করেছিল।

তোমার না আসার কথা এখন?

হ্যা, আমি গাড়িতে।

এখনো গাড়িতে! হতাশার সুরে বললো।
বললাম, কাল সকালে আসছি। ও খুব কষ্ট পেল।
বললো, এসো। কিন্তু আমাকে বোধহয় পাবে না।
উহু! পাগলামি করছো কেন? সকালে তো দেখা হচ্ছেই।
পরদিন দশটার দিকে গেলাম ওর কাছে।

রেগেমেগে ফুলে আছে।
চুপচাপ রিকশায় উঠলাম।
ও চেচাচ্ছে।
আমি শুধু শুনে যাচ্ছি।
রিকশাচালক বার বার পেছনে ফিরে বোঝার চেষ্টা করছে ঘটনাটা কি! মেয়েটা এই ভাবে নিরিহ ছেলেটাকে বকছে কেন?
লাইব্রেরির পছনে এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরলো। শুরু হলো হাউমাউ করে কান্না।
পড়েছি মহা সমস্যায়। আশপাশের জুটিরা হা করে তাকিয়ে আছে। ছাড়িয়ে দিতে পারছি না। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। বললাম, সরি, সরি, সরি আর কখনো এমন করবো না।
কান্না আরো বাড়লো।
কিছু বললাম না।
দেখুক যে খুশি।

পূর্ণ ঠিকানা বিহীন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

প্রশ্ন

আমি আইএসসি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। নিজ জেলা শহরের একটি কলেজে পড়ি। দেখতে খারাপ নই। এ+ না হলেও 'এ' বললে ভুল হবে না। প্রভাবশালী বাবা-মায়ের একমাত্র কন্যা। সে জন্য হাজারো ছেলে থেকে শুরু কর গৃহশিক্ষক পর্যন্ত প্রেমের প্রস্তাব দিতে কার্পণ্য বোধ করে না। আমি তো সব কিছুই বুঝি যে আমার জন্য সবে যতোটুকু না পাগল তার চেয়ে বেশি পাগল আমার বাবার সম্পত্তির জন্য। সে জন্য প্রেমের প্রস্তাব পেলে একটু হেসে বলিউড-এর নায়কদের কথা ভাবি। তাছাড়া আমার জীবনে গাইড হিসেবে আমার এক মামাতো ভাইয়াকে পেয়েছি যার কোনো তুলনা করা যায় না। শিক্ষিত, রুচিবান এবং প্রথম শ্রেণীর একজন অফিসার। তাদের বিয়ে হয়েছে গত চার বছর হলো। তবুও আমার যে কোনো জটিল সমস্যা দেখা দেওয়া মাত্রই তাকে পাশে পাই। ভাবীও চমৎকার মানুষ। আমি ভাবীর চেয়ে ভাইয়ার সঙ্গে বেশি খোলামেলা। ভাইয়াও সব সময় আমাকে পাখির ছানার মতো করে আগলে রাখেন।
মা-বাবা জরুরি কাজে নানিবাড়ি যান।
মায়ের ঘর অগোছালো দেখে নিজে গোছাতে যাই। টিভি, ক্যাসেট প্লেয়ার, সিডি প্লেয়ারের ধুলাবালি সব পরিষ্কার করি এবং সব কিছু ঠিকঠাক রাখতে গিয়ে নাম বিহীন দুটি সিডি ক্যাসেট পাই। সব কিছু ঠিক মতো গোছানো হলে একটি সিডি ক্যাসেট সিডি প্লেয়ারে অন করি। তাৎক্ষণাৎ টিভির পর্দায় যা দেখলাম তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না।
সেই প্রথম নীল সিনেমা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হলো। একজন রক্তে মাংসে গড়া মানবী হিসেবে যা হওয়া প্রয়োজন তখন আমার তাই হচ্ছিল। বাধ্য হলাম আমার শ্রদ্ধেয় ভাইয়াকে মোবাইল করতে।

তিনি মোবাইল পাওয়া মাত্রই ছুটে এলেন। প্রশ্ন করলেন, নতুন কোনো সমস্যা?

সেই মুহূর্তে আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর ভাইয়াকে বাবা–মায়ের রুমে নিয়ে গিয়ে সিডি প্লেয়ার অন করে দিলাম।

তিনি টিভি পর্দায় চোখ দেয়া মাত্রই বললেন, স্টপ ইট, তাড়াতাড়ি বন্ধ করো।

সঙ্গে সঙ্গে সেট বন্ধ করে দিলাম। লজ্জা, শরম বাদ দিয়ে ভাইয়াকে বললাম, তুমি যদি এই মুহূর্তে আমাকে গ্রহণ না করো তাহলে বাধ্য হবো বাইরের কারো কাছে যেতে। নিজেকে কোনো ভাবেই ধরে রাখতে পারছিলাম না। কি যে এক যন্ত্রণায় ছটফট করছিলাম যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

যে বাগানে ভ্রমরা তো দূরের কথা, একটি পিপড়া পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারেনি সে বাগান নিজ হাতে বিসর্জন দিতে ব্যস্ত হলাম।

আমার চোখের পানি আর মনের অবস্থা বুঝে হয়তো ভাইয়া রাজি হলেন। আমাকে তার সমস্ত আদর, ভালোবাসায় পূর্ণ করে দিলেন।

এক সময় দুজনে শীতল হয়ে গেলাম।

সেদিনের পর থেকে যখনি ভাইয়ার ভালোবাসা পেতে মন চায় তখনি মোবাইল করি এবং তিনি শত ব্যস্ততার মাঝে আমাকে তার ভালোবাসা দিয়ে পরিপূর্ণ করে যান যা ভাবী কোনোদিন টের পাবেন না।

এখন প্রশ্ন, দায়ী কে?

বাবা, মায়ের অসাবধনতা, নাকি আমার বয়স?

নাম ঠিকানা বিহীন

ভা- ভ্র

– কাজী এসএম সায়েম

ভা–ভ্র মানে ইনডিয়া ভ্রমণ। এ পর্যন্ত মোট দুবারের ইনডিয়া ভ্রমণে যে মজার উদ্ভট এবং ট্র্যাজিক অভিজ্ঞতা হয়েছে তা যাযাদির পাঠকদের জানাতে চাচ্ছি।

ভা- ভ্র উদ্ভট

বম্বে (মুম্বাই শব্দটিই সঠিক, তবে আমার পুরনো নাম, বম্বে বলতেই বেশি ভালো লাগে), পুনে ও গোয়ার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে কলকাতায় এলাম। তিন দিন থাকবো। আমি একা।

প্রথম দিন ওয়েস্ট বেঙ্গল টুরিজম–এর সঙ্গে পুরো কলকাতা ঘুরে দেখা হলো।

দ্বিতীয় দিন শনিবারে সায়েন্স সিটি ও অ্যাকোয়াটিকা ঘুরে দেখলাম।

রবিবার ভোরে ঠিক করলাম কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকান এবং কফি হাউসে বেড়াবো। বিকেলে জোড়াসাকো দেখতে যাবো।

কলেজ স্ট্রিট ও কফি হাউসের পালা শেষ করে পার্ক স্ট্রিটে নিজের ডেরায় ফিরে এলাম।

বিকেলে হোটেল ম্যানেজারকে জোড়াসাকোতে কিভাবে যাবো জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, পার্ক স্ট্রিট থেকে মেট্রোতে করে এমজি (মহাত্মা গান্ধী) রোড গিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই জোড়াসাকোর ঠাকুর বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

সেই মতোই গেলাম। গিয়ে একজন আঠারো বিশ বছরের ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িটা কোন দিকে?

বললো, তা তো বলতে পারবো না। বাড়ির নাম্বারটা বলতে পারেন?

আমি তো শুনে থ। বললাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানে বিশ্বকবি, নোবেল বিজয়ী জোড়াসাকোয় থাকতেন। ঠাকুর পরিবার।

বললেন, কি জানি বাপু! নাম্বার বলতে পারলে হয়তো সাহায্য করতে পারতাম। বলে হন হন করে চলে গেল। হা করে তাকিয়ে থাকলাম।

এরপর এক দোকানে গিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন, এদিকে তো কোনো রবিবাবু থাকেন বলে তো জানা নেই।

বললাম, না, না এখন থাকেন না, আগে ছিলেন কবি, বিশ্বকবি, নোবেল পেয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারের বাড়ি।

বললেন, তা তো জানিনি খোকা!

অধিক শোকে পাথর হয়ে কয়েকজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু একই উত্তর পেলাম।

পরে একজন ট্রাফিক পুলিশ পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি দেখিয়ে দিলেন।

গেলাম সেখানে। কিন্তু ততোক্ষণে পাচটা বেজে গেছে। বাইরে থেকেই যা দেখলাম। কলকাতার এমজি রোডবাসী ঠিকানা আর বাড়ির নাম্বার খুজতে খুজতে আমার রবিঠাকুর দেখা সাঙ্গ করলো।

ভা- ভ্র মজার

সেদিন সন্ধ্যাতেই সল্ট লেকে এক পরিচিত বড় ভাইয়ের দিদির বাসায় গেলাম। দিদির পুরো পরিবার বাংলাদেশেই থাকেন। কেবল তিনি কলকাতায় সেটলড হয়েছেন। দিদির দুই সন্তানই কলকাতার বাইরে পড়াশোনা করে আর দিদি বাসায় প্রাইভেট পড়ান। দিদির বেশ পসার।

তিনি এইচএসসির পর ভর্তি কোচিংও করান মনে হলো। কেননা সন্ধ্যায় আমি যাবার পর এক মধ্য বয়স্ক দম্পতি এলেন তাদের ছেলেকে নিয়ে যে এবার ব্যাংগালোরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে এবং সে দিদির ছাত্র ছিল। গুরুর পদধূলি নিতে এসেছে।

তা আগত ভদ্রমহিলা ডাইনিং টেবিলের ওপর দুই প্যাকেট ভর্তি আম দেখে চিৎকার করে বললেন, এতো আম!! কদ্দিনে শেষ করবেন দিদি? খালি খালি অপচয়। ওম্মা! পাচ সাত কিলো, এই দেখো দেখো। বলে তিনি তার পতিদেবকে দেখাতে লাগলেন।

তিনিও অপচয়ের সম্পর্কে কিছু বক্রোক্তি করলেন। আমগুলো আমিই নিয়েছিলাম, ল্যাংড়া আম পাচ কেজি। মাত্র ষোল টাকা প্রতি কেজি।

ও হ্যা, যার জন্য এই গল্প ফাদা তারা দুই প্যাকেট মিষ্টান্ন নিয়ে এসেছেন। প্যাকেট দুটোর সাইজ ৬×৪×২। আরো অবাক হলাম এই জন্য, ওই দুই প্যাকেটে পাচটি করে মোট দশটি (?) মিষ্টি।

এখন লাগলো ভেজাল। কেননা আমরা মানুষ মোট ছয়জন (ওরা তিনজন, দাদা, দিদি ও আমি)। কে একটা খাবে আর কে দুটো খাবে? শেষে দাদা ডায়াবেটিস ও বয়সের কথা বলে সবাইকে উদ্ধার করলেন মনে হলো। জয়তু কলকাতাবাসী।

ভা- ভ্র ট্র্যাজিক

প্রথমবার ভারত ভ্রমণে শিলং, মেঘালয়ের রাজধানী গিয়েছিলাম। শিলং টুরিজমের সঙ্গে চেরাপুঞ্জি দেখতে গেলাম। চেরাপুঞ্জি যেতে যেতে পথের দুই পাশে প্রচুর জলপ্রপাত। কিন্তু তখন শীতকাল বলে সব জলপ্রপাত প্রায় শুকনো ছিল। একটি জলপ্রপাত নাকি সারা বছরের কখনোই শুকায় না। সেই জলপ্রপাতটির নাম *নো কা লিকাই ফলস*।

এই নো কা লিকাই ফলস নিয়ে একটি গল্প আছে যা আমাদের গাইড অ্যানি খুব সুন্দর করে বলেছিল। অ্যানিও খুব সুন্দর ছিল, আমাদের আতিক তো আরেকটু হলে তার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল। রাজীব ও রঞ্জন কোনো রকমে ওকে পতন থেকে বাচিয়েছে। সেই গল্পটি এখন বলবো।

লিকাই নামে একটি তরুণী ছিল। খুব উচ্ছ্বল, চঞ্চল। সে ছিল ডিভোর্সি এবং একটি কন্যা সন্তানের মা। মেয়েকে ভালোভাবে লালন-পালন করার জন্য সে মাঠে মজুর খাটতো। এক সময় তার আবার বিয়ে হয়। কিন্তু নতুন বর তার মেয়েকে পছন্দ করে না, এমনকি সহ্যও করতে পারে না।

একদিন লিকাই কাজের উদ্দেশ্যে বাইরে গেলে তার বর এসে লিকাই-এর মেয়েকে জবাই করে। এরপর শরীরের মাংস কুচি কুচি করে কেটে খুব সুন্দর করে রান্না করে এবং উচ্ছিষ্ট অংশ দূরে ফেলে দেয়।

বিকেলে লিকাই বাসায় আসে। ক্ষুধার্ত লিকাই।

তার বর তাকে বলে, তোমার জন্য আজ খুব মজা করে মাংস রান্না করেছি। খেয়ে দেখো।

প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত লিকাই হাপুস-হুপুস করে সেই মাংস দিয়ে ভাত খায়।

বলতে বলতে অ্যানি কেদে দিয়েছিল।

খেয়ে বলে, অনেক দিন পর পেট পুরে ভাত খেলাম আর রান্নাটাও চমৎকার হয়েছে।

এদিকে সন্ধ্যা গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু লিকাইয়ের মেয়ে তখন ঘরে ফেরেনি বলে লিকাই তাকে খুজতে বের হয়। এদিক-সেদিক অনেক দিকে খুজে না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথে লিকাই ঘরে ফিরে আসে। আসার পথে ঘরের সামনে এক কোনায় একটি কাটা আঙুল দেখতে পায়। আঙুলটি সে কুড়িয়ে নেয় এবং সে বুঝতে পারে, এটি তার মেয়েরই আঙুল। সে আরো বুঝতে পারে, আজ সে যে মাংস দিয়ে ভাত খেয়েছে সেটি তারই মেয়ের মাংস।

এরপর লিকাই চিৎকার করতে করতে সেই ফলসের দিকে দৌড়ে যায় এবং সেখান থেকে লাফিয়ে... (এই বলে অ্যানি থেমে যায় এবং চোখ মুছতে থাকে। এরপর থেকেই ওই ফলসের নাম হয় নো কা লিকাই ফলস।

জানা যায়, এখনো নাকি রাতে সেই ফলস থেকে মাঝে মধ্যে কান্না ভেসে আসে আর সেই অশ্রু জলই সারা বছর অঝোরে ঝরতে থাকে।

মহাখালী, ঢাকা থেকে

শুকতারা

– তারেক

শুক্রবার, ডিসেম্বরের ৪ তারিখ। সন্ধ্যায় নাশতার পর আয়েশ করে একটি সিগারেট টানছি। একটু পরেই টিউশনিতে যেতে হবে, সেই মহাখালিতে। *মহাখালি* জায়গার নামকরণ যিনি করেছিলেন, আজ বেচে থাকলে তার চেহারার কি দশা হতো তা দেখতে খুব ইচ্ছা হয় মাঝে মধ্যে। যেখানে বিন্দুমাত্র খালি জায়গা নেই তারই নাম রেখেছে মহাখালি। যতো সব অদ্ভুত ব্যাপার এই ঢাকায়।

যাই হোক। সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে উঠে দাড়ালাম। এখনই রওনা না হলে আটটার আগে পৌছানো যাবে না।

বাসের জনসমুদ্রে আর্দ্র স্নান শেষে যখন ছাত্রের বাসায় পৌছালাম তখন রাত সাড়ে আটটা এবং এই দেরির জন্য ছাত্রের মাকে জ্যামের কৈফিয়ত দিয়ে তাকে যখন পড়ানো শেষ করলাম তখন রাত দশটা।

অনেকটা মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির মতো এ মাসের টাকাসহ ঈদ উপলক্ষে ছাত্রের মা এক হাজার টাকা বেশি হাতে গুজে দিলেন।

বেশ ফুরফুরে মেজাজে রাস্তায় নামলাম। নেমেই চোখ গেল কিছু মেয়েমানুষের দিকে। ওরা শরীর ব্যবসায়ী। প্রচণ্ড ঘৃণা আর রাগ হলো ওদের ওপর। এমন জঘন্য একটা কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজই কি নেই এ পৃথিবীতে?

যাই হোক। এখানে থেকে এসব ভাবা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইতিমধ্যেই ওরা আমাকে খদ্দের ভেবে এগিয়ে আসা শুরু করেছে। হাটতে হাটতে কিছুটা অগ্রসর হতে হঠাৎই অল্প বৃষ্টি শুরু হলো। এ শীতে যা একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত। তাড়াতাড়ি যাত্রী ছাউনিতে গিয়ে দাড়ালাম।

বৃষ্টি ক্রমেই বাড়ছে। আজ শুক্রবার হওয়ায় তেমন লোকজনও নেই। একা আমিই দাড়িয়ে আছি। এই বৃষ্টিতে ভিজে বাসে উঠতে ইচ্ছা করছে না। আবার একটা সিগারেট ধরালাম। পকেটে থাকা টাকার কথাটা এমন সময়ই মনে পড়লো। এতো টাকা পকেটে নিয়ে এখানে থাকা ঠিক হবে না।

একটা বাস এসে থামতেই যেই উঠতে যাবে তখনই পেছন থেকে একটা নারী কণ্ঠ বলে উঠলো, আপনার টাকা পড়ে গেছে।

নিচে তাকিয়ে দেখি পুরো চার হাজার টাকাই পড়ে গেছে। ওই টাকাগুলো সিগারেট কেনার সময় সম্ভবত ফাকতালে গড়ে গিয়ে থাকবে। টাকাটা তুলে নিয়ে কৃতজ্ঞ চোখে তার দিকে চাইলাম।

দেখি মেয়েটা হাসছে।

বললাম, ধন্যবাদ। টাকাটা হারালে সর্বনাশ হয়ে যেতো, পুরো মাসটা এ দিয়েই চলতে হবে।

সে বললো, কেমন মানুষ আপনারা বলুন দেখি? যা দিয়ে চলতে হয়, তাই এতো অবহেলায় ফেলে দেন? আসলে ওতো আপনারা এমনিতেই পান, তাই এই অবস্থা।

এ কথা শুনে মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। বললাম, পুরো এক মাস সপ্তাহে চার দিন প্রায় পাচ ঘণ্টা করে সময় ব্যয়ের ফসল এই টাকা আর আপনি বলছেন এমনি এমনি পাই?

সে বললো, অবশ্যই না। কারণ আমার মূলধন একটাই, আমার শরীর।

হতবাক হয়ে গেলাম।

কি, ঘৃণায় বমি আসছে না, কি? আপনারা পবিত্র মানুষ। পবিত্রতা রক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকেন। রাতে আমাদের কাছে অনেকেই আসেন এবং আমাদের অপবিত্র ছোয়ায় পুনরায় পবিত্র হয়ে চলে যান। অপবিত্র থেকে যাই কেবল আমরাই।

যেন বিচার দিল আমার কাছে।

এতোক্ষণ যে বৃষ্টিতে ভিজছিলাম, খেয়ালই ছিল না। হঠাৎই যেন প্রচণ্ড হিম আমাকে গ্রাস করলো। ভেতরে এসে দাড়ালাম।

চুপচাপ দাড়িয়ে আছি দুজনে।

হঠাৎই মেয়েটা আমার হাত টেনে নিয়ে হাটা শুরু করলো। আস্তে আস্তে করে বললো, পুলিশ আসছে, এখনই সরে না পড়লে ওরা টাকা আদায় করবে। আমাকে চেনে ওরা।

কিছু বললাম না। কেবল নিঃশব্দে হাটতে থাকলাম। ঘটনার আকস্মিকতা আমাকে এখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

কিছু দূরে হাটার পর সে পেছনে তাকিয়ে আমার হাত ছেড়ে দিল।

পুলিশকে আর দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ করেই মনে হলো শরীর এই প্রচণ্ড শীতেও ঘামছে। আসলে জীবনে কোনো নারীর সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে থাকা এই প্রথম। সমস্ত শরীর যেন এক জোট হয়েছে আমার মনের সঙ্গে। এবার ওরা আমাকে শেষ করে দেবে।

এবার আমি তার হাত ধরলাম এবং নামটা জিজ্ঞাসা করলাম।

অভয়া। বললো সে।

শ্রীকান্তের অভয়া?

না, আমি অতোটা নিষ্পাপ কিংবা সুন্দরী কোনোটাই নই।

বিস্মিত হৃদয়ে এক বারবণিতার মুখে আধুনিক শিক্ষিত রমণীর ছবি দেখলাম।

অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন তার সঙ্গে ঘুরেছি, কখনো রাস্তায়, কখনো ফুটপাথে, কখনো রেললাইনে। ভয় ছিল পুলিশের, ভয় ছিল মানুষের। তবুও নারীর গন্ধ আর ব্যক্তিত্ব আমায় ধরে রেখেছিল চুম্বকের মতো। মোহাবিষ্টের মতো তাকে দেখেছি। খুজেছি তার সত্ত্বাকে। অর্থের বিনিময়ে নয়। অর্থ সে দাবিও করেনি আমার কাছে। আমিও তাকে সাধিনি।

ভোরে কুয়াশার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে বের হলাম। একবার পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি, দাড়িয়ে এক নারী যার পরাজয় আমাদের জয়ের চিরন্তন উৎস। সে বিধ্বস্ত। তবুও কি এক মায়ার চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

মুখ ফিরিয়ে নিই। জানি বাস্তবে তাকে নিয়ে এগোনোর সাহস আমার নেই। ভেতরে আরেকজন বলে উঠে, তাতে কি? আধারেই ভোগ হোক না হয়।

হেসে উঠি আপন মনে। কারণ আমি জানি আমার ভেতরে অনেক জনেরই বাস। একেক সময় এক একেকজন জেগে ওঠে, আর আমি হয়ে যাই তার দাস।

জুনের ৬ তারিখ। পান্থপথ দিয়ে হেটে ফিরছিলাম এক বন্ধুর বাসা থেকে। রাত। আকাশে মেঘের গুড় গুড় শব্দ চলছিল অনেকক্ষণ ধরেই। এবারে নেমে এসেছে অঝোরে। বৃষ্টিতে ভিজতে আমার সব সময়ই ভালো লাগে আর ভিজতে ভিজতে হাটছিলাম সেদিনও।

পেছন থেকে ভেসে এলো এক নারীকণ্ঠ, একটু দাড়াবেন?

পেছন ফিরলাম। শরীর বেয়ে যেন ভয় ও আনন্দের একাধিক শিহরণ মাথা থেকে মাটিতে নেমে এলো।

আরে শেষ পর্যন্ত এক বেশ্যার শরীরের কাছেই হার মানলি? বলে উঠলো ভেতরের মানুষটা। ভয়ে আতকে উঠলাম নিজের কাছে, সমাজের কাছে হেরে যাওয়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ ধরে দুজনে তাকিয়ে রইলাম একজন আরেকজনের দিকে।

কেমন আছেন, বললো অভয়া।

আমি নিশ্চুপ। ভাবছি এ খারাপ নারী কতো কিছুই না ঘটিয়ে দিয়েছে এ জীবনে? প্রথম দিন আর আজকের মধ্যে ব্যবধান তো কেবল মাস ছয়েক। তবুও এ যেন দীর্ঘ পথ। তাতে হারানোর বেদনা যেমন আছে, আছে পাওয়ার সুখও। জীবনে প্রথমবারের মতো সে দিয়েছে প্রেমের ছোয়া। প্রেম, হ্যা, প্রেমই তো। কেবল শরীরের কথাই তো নয়, কথা হয়েছিল মনের মধ্যেও।

কিছু বলছেন না যে? প্রশ্ন অভয়ার।

গত এক মাস কোথাও তোমাকে খুজে পেলাম না। তুমিও তো দেখা করলে না। আমার ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া উত্তর।

আমার তো দিন শেষ হয়ে আসছে। যে কোনো মুহূর্তেই ডাক আসবে উপরের। আপনার সঙ্গে এর আগে একবার দেখা করা জরুরি ছিল। অভয়া কেমন যেন ভয় ধরা গলায় বললো কথাগুলো।

জরুরি কারণটা জানতে চাই না। কেন যেন ঠিক আগ্রহ হয় না। তবুও দায়সারাভাবে জানতে চাই কি হয়েছে।

এইডস।

অভয়ার এই জরুরি সংবাদে আমার রক্ত স্থির হয়ে গেল। না না, ঠিক তার জন্য নয়। ভয় অন্যখানে। তবে কি আমারও...?

এই ভাবনাটা মাথাটাকে এফোড়-ওফোড় করে দিচ্ছিল।

মনে হয় না আপনার ভয় পাওয়ার কারণ আছে। তবুও একবার পরীক্ষা করে দেখুন।

অভয়ার এই অভয় বাণী আমাকে ঠিক নিশ্চিন্ত না করলেও কেন যেন অনেকটা হালকা করে দেয়।

আমার একটাই প্রার্থনা, নিজের পাপের বিষ যেন আমার ভালোবাসার মানুষের শরীরে না দিয়ে যাই।

মনে মনে অভয়ার এই প্রার্থনাটা সত্যি হোক, তা–ই চাই। যদিও পাপের বিষটা শুধুই তার কি না সেই ব্যাপারে নিশ্চিত নই।

উপরের দিকে তাকাই। মেঘেরা অবিরাম যুদ্ধ করে যাচ্ছে এখনো। আকাশের কাছে প্রশ্ন করি, পৃথিবীতে যতো স্বার্থপরতা আছে, সবই কি তুমি আমাকে ঢেলে দিয়েছো? নইলে যে মৃত্যু পথচারী এখনো মৃত্যুকে মেনে নিতে পারছে না কেবল এই জন্য যে মৃত্যুর আরো একজনকে হয়তো গ্রাস করবে, অথচ আমি একবারও নিজের কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছি না।

পরশু এখানেই থাকবো। আপনি ব্যাপারটা নিশ্চত হয়ে আমাকে জানাবেন। আপনি কথা রাখবেন আমি জানি।

আমার ভাবনায় ছেদ পড়ে।

রিপোর্টের প্রতীক্ষায় বসে থাকি। মাথায় এখন আর কোনো ভাবনাই নেই। গত দুদিনে নিজেকে জানলাম আরেকভাবে। নিজের মাঝে এমনই একজন যে বাস করতো, সে সত্যই ভালোবাসতে জানে, আমিও এতো প্রকটভাবে তা জানতাম না। এখন এ জানাটাই আমাকে করেছে নির্ভার, আশ্চর্য রকম নির্ভার।

রিপোর্ট এসেছে। নেগেটিভ রেজাল্ট। জীবনের দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা আমাকে তেমন আন্দোলিত করে না। উঠে দাড়াই। এখনই সময়।

সে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। আমারও এইডস হয়েছে, মিথ্যা কথাটা তাকে বললাম।

সে কিছু বললো না। পাশ ফিরলো কেবল। এক মুহূর্তের জন্য তার চোখ দুটো দেখলাম, জলকণা চকচক করছে। এভাবেই কাটালো অনেকক্ষণ। হঠাৎই যেন একটু কেপে উঠলো অভয়া। আমার চোখে চোখ রাখলো।

বললো, আমি জানি, আপনি আমাকে মিথ্যা বলেছেন কেবল শুধু আমারই পাশে থাকার জন্য, আমার ভালোবাসাটা ধরে রাখতে। আমি হয়তো থাকবো না। আপনি থাকবেন। আপনার মাঝেই আমাদের ভালোবাসা বেচে থাকবে। আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। এই কষ্ট নষ্টের জীবনে একবারের জন্যও সুখ কি তা বুঝিনি। আজকে ...। কি যেন বলতে চেয়েছিল অভয়া।

দারুণভাবে একটা ঝাকি খেলাম। অভয়ার মাথাটা হেলে পড়লো কোল থেকে। হঠাৎ করেই মনে হলো অভয়া যেন তার সমস্ত ভার আমার ওপর নিশ্চিত নির্ভরতায় ছেড়ে দিল।

আকাশের দিকে চেয়ে আছি।

তারারা সব যেন কোথায় লুকিয়ে আছে আজ।

কেবল শুকতারাটাই চেয়ে আছে আমার দিকে।

আমিও তার দিকে।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হওয়ার পথে।

এক সময় শেষও হয়ে যাবে।

পূর্বের সূর্যের ঝলকানিতে কোথায় ছিটকে পড়বে শুকতারা!

মুছে যাবে অশ্রুর দাগ।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

ঝিনুক

– লুলু বিলকিস

ছোট ভাবির টেলিফোনে যখন সৈয়দের মৃত্যুর কথাটি শুনলাম তখন যেন ইলেকট্রিক শক খেলাম।

মানুষ মরণশীল জেনেও কোনো কোনো মৃত্যু মানুষ সহজে মেনে নিতে পারে না। তেমনি সৈয়দের মৃত্যুও আমার মেনে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল।

সৈয়দ আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু ছাড়াও আমার দূরসম্পর্কে আত্মীয়। কিন্তু সে ছিল আমার ছোট ভাইয়ের চেয়েও অনেক কাছের। আমার ছোট ভাই এইচএসসি পাস করে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে চলে গেলে সে আমাদের পরিবারে ছোট ছেলের শূন্যস্থানটি পূরণ করে রেখেছিল। মানুষ মানুষের এতো আপন হতে পারে – কথাবার্তায়, চালচলনে, আচরণে সেটাই প্রমাণ করেছিল সে আমাদের কাছে।

সেই সৈয়দ আজ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চিরদিনের জন্য চলে গেল। ভেবে হৃদয়ে আমার অব্যক্ত হাহাকার অশ্রু হয়ে দুই গাল বেয়ে নীরবে ঝরতে লাগলো। মাত্র এক মাস আগে ডাক্তার বলেছিল, তার লাংসে ক্যান্সার হয়েছে। সে কথাটিও শুনেছিলাম তার মৃত্যুর পর।

মাত্র পাচ বছর আগে সে বিয়ে করেছিল। তিন বছরের একটি মেয়ে আছে তার। স্ত্রী ঝিনুক এইচএসসি পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়েছিল তার। বিয়ের পর আর পড়া হয়নি ওর।

সৈয়দ চাকরি করা পছন্দ করতো না। সে ব্যবসাকে পেশা হিসেবে নিয়েছিল। কিন্তু ব্যবসাতে সে তেমন সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ফলে সংসারের টানাপোড়েন লেগেই থাকতো। আত্মীয়স্বজনের সহায়তায় এই দুরারোগ্য অসুখের চিকিৎসা হলেও মৃত্যুর সময় তার স্ত্রী ও কন্যাকে কপর্দকহীন অবস্থায় রেখে যেতে হয়েছে।

প্রথম দুই তিন মাস আত্মীয়স্বজনের সহায়তায় কেটে গেলেও জীবন তরী এক অজানা চরে আটকে পড়ার উপক্রম হচ্ছে বুঝতে পেরে অর্ধশিক্ষিত মেয়ে ঝিনুক শংকিত হয়ে পড়লো। কি করবে সে কিছুই বুঝতে না পেরে দুই চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো।

সেই মুহূর্তে সে কেবল স্বামীর মুমূর্ষু অবস্থায় করুণ কথাগুলোই মনে করতো। ঝিনুক, আমার মেয়েটিকে তুমি দেখো, আমি ওর জন্য কিছুই রেখে যেতে পারলাম না। যদি তুমি কোনোদিন অন্য কারো ঘরে যাও তবে মেয়েটিকেও যেন সঙ্গে নিয়ে যেও, তুমি আমাকে কথা দাও।

ঝিনুক কান্না বিজড়িত কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়েছিল স্বামীকে, ওগো, আমি কোথাও যাবো না, সারা জীবন তোমার স্মৃতি নিয়ে কাটিয়ে দেবো।

ঝিনুকের দেয়া আশ্বাস পেয়ে সৈয়দ যেন পরম শান্তিতে চোখ বুজেছিল।

ঝিনুক দুই চোখের পানি মুছে আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে দাড়ায়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, যেভাবেই হোক নিজ পায়ে দাড়াতে হবে তাকে। সে বেরিয়ে পড়ে ভাগ্য তৈরি করতে।

স্থানীয় একটি সেলাই শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে সেলাইয়ের ওপর ট্রেনিং নিতে লাগলো এবং পাশাপাশি সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের মেয়েদের ইউনিফর্ম সাপ্লাইয়ের কাজ পেয়ে গেল। ওই কলেজের অধ্যক্ষা একজন জনদরদি মহিলা এই ধরনের অনেকের রুটি–রুজির ব্যবস্থা করেছেন তার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। কতোজন তার বেকার জীবনের অবসান ঘটিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার হিসাব নেই। ঝিনুকের অবস্থার কথা তার কানে যাওয়ামাত্রই তিনি তাকে ড্রেস সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থাটি করে দিলেন।

এই কাজটি পেয়ে ঝিনুক তার অন্ধকার জীবনে আশার আলো দেখতে পেল। সে অদম্য উৎসাহে কাজ শুরু করে দিল। একজন গৃহবধূ জীবনের প্রয়োজনে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে অনেক প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবনকে নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম হয়েছে।

চার বছর পর এখন ঝিনুকের অবস্থা এমন, সে একটি টেইলারিং দোকানের মালিক হয়েছে, পাচটি বিভিন্ন রকম মেশিন কিনেছে, চারজন শ্রমিক নিয়মিত কাজ করে। সিজনের সময় আরো অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করে। তাছাড়া সেও হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। মেয়েটিকে রাজধানীর সেরা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। বড় বোনের বাড়ির কাছেই একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকে সে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পাঠক–পাঠিকার উদ্দেশ্য বলতে চাই, আমার এ লেখাটি কোনো বানানো গল্প নয়। এ গল্প জীবন থেকে নেয়া। এমনকি গল্পের নায়ক নায়িকার নামও পরিবর্তন করা হয়নি। মানুষের জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তা কল্পনাকে হার মানায়। তাই জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোই সর্বোত্তম এবং শিল্পসমৃদ্ধ গল্প। এ গল্প পড়ে যদি একজন

মানুষ ও তাদের স্বপ্ন তার বাস্তবের দ্বন্দ্বে পরাজয় স্বীকার না করে জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে ঝিনুকের মতো সমাজে সম্মানজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তবেই আমার এ লেখা সার্থক হবে।

বেইলি রোড, ঢাকা থেকে

বাড়ি ফেরা

– জি.এম ইকবাল

১৯৯১ সালের কথা। আমি তখন ফরিদপুর আটরশি আউলিয়া মাদ্রাসার ক্লাস ফোর–এর ছাত্র। নারায়ণগঞ্জ বাড়ি হয়েও ফরিদপুর হস্টেলে থেকে পড়ালেখার কারণ হলো এলাকার স্কুলে আমার ক্লাসের এমন কোনো ছাত্রছাত্রী বাকি নেই যে কি না আমার হাতে মার খায়নি। অনেক ছাত্র আমাকে স্যারদের চেয়েও বেশি ভয় পেতো। স্লেট ভাঙা, বই ছেড়া, ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দেয়া এসবই ছিল আমার কাজ।

প্রতিদিনই বাড়িতে বিচার আসতো। স্যাররাও প্রচুর শাসন করতেন। তাই আব্বা রাগে–জিদে আমাকে ভর্তি করে দিয়ে এলেন ফরিদপুরে।

এখানে স্যারদের শাসন বড় কঠিন। নতুন জায়গা, পরিচিত কেউ নেই। তাই এক সময় আমার দুষ্টুমিগুলো হঠাৎ করেই চুপ হয়ে গেল।

আব্বা প্রতি মাসে এসে আমার খোজখবর ও টাকা দিয়ে যেতেন। বিদায়ের সময় রুমালে চোখ মুছতেন।

একদিন হঠাৎ আব্বা নতুন জামা নিয়ে এসে আমাকে বললেন, সুমনের জন্যও তোমার মতো জামা কিনে দিয়েছি ঈদে পরার জন্য।

হস্টেলের সবার আগে ঈদের জামা পেয়ে আমি তো বেজায় খুশি। রমজান মাস, মাদ্রাসা বন্ধ নেই। এ জন্য আব্বার সঙ্গে বাড়ি যেতে পারলাম না। তবে বাড়ি যাওয়ার জন্য আমার মনে দুঃখ নেই। এতো দিনে এখানে সবার সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে ঊনত্রিশ রমজান চলে এলো। মসজিদে ইফতার ও নামাজ পড়ে যখন বাইরে বের হলাম তখন ঈদের চাদ ওঠার সংবাদ পেলাম। এর মধ্যেই আমার মতো ছোট বাচ্চারা আতশবাজি ফুটিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছে। দৌড়ে রুমে গেলাম। কিন্তু একি! রুমে কেউ নেই শুধু মুখলেস ছাড়া। ও তার কাপড়–চোপড় ব্যাগে ঢোকাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি রে, কোথায় যাচ্ছিস?

উত্তরে সে বললো, সবাই বাড়ি চলে গেছে, আমিও যাচ্ছি।

আমার রুম মেম্বারদের সবাই ছিল ফরিদপুরের অধিবাসী। সবাই সবার ঠিকানায় চলে গেছে।

কিন্তু আমি কি করে যাবো? আমি যে ভালো মতো পথঘাটও চিনি না। হতাশায় পড়ে গেলাম। ঈদের আনন্দ মন থেকে উধাও হয়ে গেল। চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো। স্টিলের ট্রাংক খুলে ঈদের নতুন জামা পরলাম। কিছু টাকা ছিল, পকেটে নিলাম। রওনা হলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে।

রিকশায় চড়ে পিয়াজখালি এলাম পদ্মার পাড়ে। অনেক আগেই সূর্য পশ্চিম আকাশে ডুবে গেছে। চারদিক অন্ধকার। ঘাটে কোনো ট্রলার নেই। নদীর পাড়ে বসেই খুব কাদছি। এমন সময় চোখে পড়লো কিছুটা দূরে একটা ট্রলার আসছে। কাছে আসতেই দেখলাম গরু ভর্তি ট্রলার।

তাদের ডাকলাম, তারা না শোনার মতোই আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। তাদের পেছনে পেছনে দৌড়াতে লাগলাম আর কাদতে লাগলাম চিৎকার করে।

এক সময় লোকগুলোর মনে মায়া হলো। তারা ট্রলার পাড়ে ভেড়ালো।

তাদের কাছে বললাম, আমি মাওয়া যাবো।

ভাগ্য ভালো তারা গরু নিয়ে মাওয়ার দিকেই যাচ্ছিল।

বৃদ্ধ বয়সের একজন আমার হাত ধরে ট্রলারে ওঠালেন। প্রায় চার ঘণ্টা আকাশের চাদ ও গরুর পালের সঙ্গে থেকে ট্রলার নোঙর করলো মাওয়াতে।

তাদেরকে সেদিন ধন্যবাদ দিইনি। কারণ তখন বুঝিনি কৃতজ্ঞতা কি জিনিস।

মাওয়া বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখি সব বাসই বন্ধ। কোনো বাসই ঢাকার উদ্দেশ্যে ছাড়বে না।

ঈদের আনন্দ আবার মাটি হয়ে গেল। ক্ষিদেয় পেট পুড়ে যাচ্ছে। কবুতরের টঙের মতো একটা দোকান থেকে কলা আর কেক খেতে খেতে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম, কাকা, আমি নারায়ণগঞ্জ কিভাবে যাবো।

দোকানদার আমাকে বসতে বললেন। অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলেন।

কলা আর কেকের দাম দিলাম।

লোকটি হাতে টাকা নিয়েও আবার ফেরত দিয়েছিলেন। জানি না কেন? হয়তো দোকানদারটির খুব মায়া লেগেছিল ঈদ পাগল একটি শিশুর ওপর।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কালো একটি ট্যাকসিক্যাব, ওপরে হলুদ ছাদ, দেশে ফেরত এক বিদেশিকে নিয়ে কাকার দোকানের পাশেই রাখলো। বিদেশ ফেরত লোকটির বাড়ি মাওয়াতেই ছিল।

কাকা তড়িঘড়ি করে দোকান থেকে নেমে ড্রাইভারের সঙ্গে কি কি যেন বলে আমাকে গাড়িতে বসতে বললেন আর ড্রাইভারকে বলে দিল আমাকে যেন পোস্তগোলার বৃজের ওই পাড়ে নামিয়ে দেয়।

ড্রাইভার তাই করলো। পোস্তগোলা বৃজের ওপর নেমে আশ্চর্য হয়ে গেলাম! শ শ লোক এতো রাতেও বৃজের ওপর থেকে খুশির চাদটাকে দেখছে।

বৃজ থেকে নেমে রাস্তার পার হয়ে দেখি টেম্পো *পাগলা, পাগলা* বলে ডাকছে।

পাগলা থেকে আমার বাড়ির ঠিকানা সহজ।

পাগলা নেমেই রিকশা নিয়ে সোজা রওনা হলাম। বাড়ির কাছে যতোই আসছি ততোই আনন্দে মেতে উঠছি। মন চাচ্ছিল রিকশা থেকে নেমে এক দৌড়ে বাড়ি আসি।

রাত প্রায় চারটা। রিকশা বাড়ির পাশেই থামলো। রিকশা ভাড়া চুকিয়ে দরজায় থাপ্পর মেরে *মা মা* বলে ডাকছি।

মা আব্বা দরজা খুলে আমাকে দেখে হতবাক হয়ে গেলেন! আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি শুরু করলেন।

সুমন ও লাকি আমাকে পেয়ে খুশিতে নাচতে লাগলো।

আজ বুঝি সেদিনের সেই খুশি মাখা ঈদের চাদ আমার মাকে আমি ছাড়া খুশি করাতে পারেনি। আমি আসাতেই ওই ঈদটি আমার পরিবারের মধ্যে খুশির বন্যা বইয়ে দিয়েছিল।

আজ দীর্ঘ চারটি বছর ধরে পড়ে আছি প্রবাস নামের উন্মুক্ত জেলখানায়। ইচ্ছা করলেই গরু ভরা ট্রলার, হলুদ ট্যাকসিক্যাবে চড়ে ঈদের আনন্দ খুজতে যেতে পারি না আমার দুঃখী মায়ের কোলে।

সউদি আরব থেকে

iqbal_gm2003@yahoo.com

স্বপ্ন পূরণ

– সলিম মাহামুদ

আমার বড় চাচাতো ভাই ১৯৯০ সালের দিকে পা বাড়ান ইটালির উদ্দেশ্যে। পূর্ব ইওরোপের বিভিন্ন দেশ পার হয়ে ১৯৯১ সালে ইটালি পৌছান। আমার বয়স তখন প্রায় চোদ্দ পনেরো।

চাচাতো ভাই তখন একটি চিঠিতে আমার বাবাকে লিখেছিলেন, কাকা, আপনি যদি রাশিয়াতে আসেন তাহলে আপনাকে ইটালি নিয়ে আসবো।

আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক। তাই বাবার হাতে নগদ টাকা ছিল না। ইটালি নামের সোনার হরিণ ধরার জন্য বাবা আমাদের বাড়িঘর প্রায় সব কিছু বিক্রি করে দিলেন। টাকা তুলে দিলেন এক দালালের হাতে।

প্রায় দুই তিন বছর পার হয়ে গেল। কিন্তু বাবার রাশিয়া যাওয়া হলো না। তখন আমার বড় ভাইয়ার বয়স ঊনিশ বিশ।

বাবা রাশিয়া যাওয়ার আশা ছেড়ে দিলেন। দালালকে অনুরোধ করলেন, ভাইয়াকে রাশিয়া পাঠাতে।

১৯৯৩ সালের শেষের দিকে ভাইয়াকে পাঠানো হলো রাশিয়ায়। ভাইয়াকে বড় চাচাতো ভাই কিছুদিন রাশিয়াতে অপেক্ষা করতে বললেন। তখন রাশিয়ায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ।

প্রায় দুই বছর পার হয়ে গেল। ভাইয়াকে ইটালি নিলেন না চাচাতো ভাই। এদিকে পরিবারের অবস্থা নুন আনতে পান্তা ফুরায়।

বাবা আমার দিন-রাত হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে চলেন ঢাকার রাস্তায়।

এভাবে পেরিয়ে গেল প্রায় সাত আট বছর।

এরপর চাচাতো ভাই ভাইয়াকে রাশিয়া থেকে ইটালি নিয়ে আসতে চাইলেন।

কিন্তু ভাইয়া ইটালি গেল না কিছুতেই।

পরিবারের সবাই ভাইয়াকে রাশিয়া থেকে ইটালি চলে যেতে বার বার অনুরোধ করে চিঠি লিখেছি।

তখন ভাইয়া ইচ্ছা করলে চাচাতো ভাইয়ের সাহায্য ছাড়াই ইটালি যেতে পারতেন।

২০০১ সালের দিকে ভাইয়া হঠাৎ বাংলাদেশে চলে এলেন। আমাদের বলা হলো, কিছু কাগজপত্র নিয়ে এসেছি। কিছু লোক নিয়ে এক দুই মাসের মধ্যে রাশিয়া চলে যাবো।

যেমন কথা তেমন কাজও শুরু হয়ে গেল। পাচ সাত লাখ টাকা নেয়া হলো ওই লোকগুলোর কাছ থেকে। প্রায় সব টাকা খরচ করে ইউক্রেইন-এর বেশ কিছু ভিসা, টিকেট এবং সব রকম কাগজপত্র তৈরি করে ফেললেন আমার ভাইয়া।

হঠাৎ কারা যেন ভেঙে দিল টুইন টাওয়ার। শুধু ওই একটা কারণেই লোকগুলোকে ভাই কোনোভাবেই পাঠাতে পারলেন না রাশিয়া বা ইউক্রেইন-এ। এতো বেশি সমস্যায় পড়ে গেল আমার পুরো পরিবার যে কথা ভাবলেই দুই চোখে পানি এসে যায়।

২০০২ সালের দিকে ছাত্র ভিসা নিয়ে পাড়ি দিলাম ইউক্রেইনের উদ্দেশ্যে। আমার এক মাত্র লক্ষ্য ইটালি। ২০০২ সালের শেষের দিকে পৌছে গেলাম ইউক্রেইনে। তখন ইউক্রেইনে কনকনে ঠাণ্ডা। চারদিকে দিন-রাত শুধু বৃষ্টির মতো বরফ পড়ে।

এক মাস পরে কলেজ থেকে পালিয়ে গেলাম এক বাঙালি দালালের বাসায়। বললাম, যেতে চাই ইটালি। সেই দালালের অবহেলার কারণে রাস্তায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ি। আমরা প্রায় বিশজন বাঙালি। জেলের মধ্য খেয়ে, না খেয়ে যে দিনগুলো কেটে গেছে ওই স্মৃতি ভুলবো না কোনোদিন।

দ্বিতীয়বার আবার যখন ইটালির উদ্দেশ্যে রওনা হই ইউক্রেইন থেকে তখন না খেয়ে, পাহাড়ের মধ্য দিয়ে হাটতে হাটতে বৃষ্টিতে ভিজে এবং রাতের কনকনে ঠাণ্ডায় নোয়াখালির ছেলে রোকন এতো বেশি অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল যেতাকে ওই গহীন পাহাড় থেকে কিছুতেই নিয়ে আসতে পারেনি ইউক্রেইনের দালাল।

২০০৩ সালের শেষের দিকে হাজারো কষ্ট অতিক্রম করে পৌছে যাই ইটালি। আমরা যারা এক সঙ্গে ইউক্রেইন থেকে পাড়ি দিয়েছিলাম ইটালির উদ্দেশ্যে, প্রায় সবার সঙ্গে যোগাযোগ হয় ফোনের মাধ্যমে।

কিন্তু আজও কোনো খোজ পাইনি রোকন নামের সেই ছেলেটির। ওর কথা মাঝে মধ্যে খুব মনে পড়ে। দুঃখের দিনে আমরা ছিলাম এক সঙ্গে।

কোনোদিন ভুলতে পারবো না আমার বড় ভাইয়ার উদাসীনতার কথা, আমার বাবার হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কথা।

ইটালি থেকে

শার্ট

– অমি

আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী পিংকি। আমরা এক সঙ্গে কলেজে যাই। আমার সব কিছু তাকে বলি। সে তার সব কিছু আমাকে বলে।

পিংকি জাবেদকে ভালোবাসে। জাবেদও পিংকিকে খুব ভালোবাসে। তাদের দুজনের দেখা হওয়ার সময় আমি উপস্থিত থাকি। রেস্টুরেন্টে খাবারের সময়ও সঙ্গে থাকি।

রেস্টুরেন্টে গেলে একটা সমস্যা থেকেই যায়। জাবেদ কফি খেতে ভালোবাসে। কিন্তু পিংকি কফি পছন্দ করে না। শেষে পিংকিই এ সমস্যার সমাধান দেয়। পিংকি বলে, পিংকির জন্য জাবেদ কফি খাওয়া ছেড়ে দেবে তা তো হতে পারে না। একজনের জন্য অন্যজন কিছু একটা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে এ কথাটা শুনতেও ভালো লাগে না। তবে হ্যা, জাবেদ যদি সিগারেট খেতো তাহলে নাকি জাবেদকে ওই নেশা ছেড়ে দেয়ার জন্য বলতো। কিন্তু তার প্রয়োজন পড়েনি। কারণ জাবেদ সিগারেট খায় না। পিংকি জাবেদকে বলে সে তার ইচ্ছা মতো কফি খেতে পারে, এতে সে কিছু মনে করবে না।

পিংকির সব কিছু আমার ভালো লাগে শুধু দুই একটি ব্যাপার ছাড়া। সে জাবেদকে মাঝে মধ্যে ফোর্স করে। পিংকিকে বলি সে যেন জাবেদকে ফোর্স না করে। ফোর্স করলে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

পিংকি ফোন ফ্যাক্সের দোকান থেকে জাবেদকে ফোন করলো।

জাবেদ জানালো, সে তার বোনের বাড়ি যাচ্ছে। আজ তার সর্ষে ইলিশ খেতে ইচ্ছা করছে। তার বোন শেফালি এই সর্ষে ইলিশ খুব ভালো করে রাধতে পারে। তাই সে নিজে ইলিশ কিনে নিয়ে বোনের বাড়ি যাচ্ছে। বোনের বাড়ি তাদের বাড়ি থেকে আধা ঘণ্টার মিনিটের পথ।

জাবেদকে পিংকি বললো, এক্ষুনি চলে এসো। কাজ আছে।

জাবেদ বললো, আমি আমার বোনের বাড়ির একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছি। সন্ধ্যার পর হলে ভালো হয়।

পিংকি আবার বললো, এক্ষুনি চলে এসো।

অগত্যা জাবেদ জিজ্ঞাসা করলো, পিংকি, এখন কোথায় আছো?

পিংকি এই রোডের নাম বলে ফোন ফ্যাক্সের দোকানের নাম বললো।

পিংকি আমাকে পুরো ঘটনা বললো।

তাকে বললাম, এ রকম করা তোমার উচিত হয়নি।

পিংকি হেসে বললো, একটু টাইটে রাখতে হয়। না হলে লাই পেয়ে যাবে।

জানালাম, বেশি টাইট দিতে গেলে ছিড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

জাবেদ এলো। এবং মিশুকের মধ্যে ইলিশ মাছ দেখালো।

পিংকি বললো, ইংল্যান্ড ফেরত এক ফুপু বাসায় এসেছিলেন। আমাকে দুই হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন। কিছু কিনে নেয়ার জন্য বলেছেন। আমি ঠিক করেছি এ টাকার অর্ধেক দিয়ে তোমার জন্য একটি শার্ট কিনে দেবো। সে জন্য তোমাকে ডেকেছি।

জাবেদ বিরক্ত কণ্ঠে জানালো, তোমার ফোন পেয়ে খারাপ কিছু ঘটেছে কি না এ ব্যাপারে চিন্তা করে এসেছি।

পিংকি জাবেদকে নিয়ে আমাদের শহরের সবচেয়ে বড় কাপড়ের দোকান এমবি ক্লথ স্টোরে গেল। এবং মেরুন কালারের একটি শার্ট পছন্দ করে দিল।

পিংকি ও জাবেদের ভালোবাসা দেখে আমার খুব ভালো লাগে। তাদের বিয়ের দিনের অপেক্ষায় আছি।

মৌলভীবাজার থেকে

পাঠানদের দেশে

– এএন ওয়াহিদ

ভালোবাসার যেমন গোল্ডেন জুবিলি করেছি তেমন রোজা রাখারও বড় একটা জুবিলি হয়ে গেছে। ১৯৪৭ থেকে তা পালন করে আসছি। রোজা রাখার পর ঈদের আনন্দই আলাদা। অন্তত ষাটটা ঈদ উৎসব উদযাপনের কথা আমার মনে আছে। সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক ঈদ উৎসবের কথাই বলছি।

১৯৬০ সালের কথা। তখন খাইবার রাইফেলস হেড কোয়ার্টার লান্ডিকোটালে কর্মরত ছিলাম। উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পেশোয়ার–এ অবস্থিত ঐতিহাসিক খাইবার গিরিপথের প্রায় শেষ প্রান্তে আফগানিস্তান বর্ডার থেকে মাত্র পাচ মাইল দূরে এই লান্ডিকোটাল ক্যান্টনমেন্টে মহা ধুমধামের সঙ্গে পালন হয় ঈদ উৎসব। খাইবার রাইফেলস প্যারেড গ্রাউন্ডে ঈদের নামাজ শেষে সবল–শক্ত পাঠানদের কোলাকুলি ও হাত মেলাতে মেলাতে বাসায় ফিরে আসার পর সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। সহ্য করতে না পেরে অবশেষে যাই সিভিল সার্জনের কাছে।

ডাক্তার জানতে চাইলেন, কেমন করে আঘাত পেয়েছি।

বললাম, কোনো দুর্ঘটনা নয়। প্রায় শখানেক পাঠানদের সঙ্গে ঈদের খুশির কোলাকুলির ফল।

তিনি একটা *জামবাক* জাতীয় ব্যাথার মালিশ দিলেন। তার দুই তিন দিন পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে কাজে যোগদান করি।

এ ঘটনায় অনেক পাঠান এসে সমবেদনা প্রকাশ করেছিল। তারা অনেক আঙুর, বেদানা নিয়ে এসেছিল।

ঝিগাতলা, ঢাকা থেকে

নাজুভাইয়ের সন্ধানে

– একেএম আলমগীর

গ্রামটির নাম বানাইচহাট। এখানে সবারই এক চিরন্তন জিজ্ঞাসা, নাজুর খবর কি? নাজু এখন এক UFO – যার অস্তিত্ব আছে বা নেই, হয়তো ছোয়া যাবে কখনো, হয়তো যাবে না।

নাজুভাই আমার বড় আব্বার দ্বিতীয় ছেলে। পুরা নাম মোহাম্মদ নাজিরুল ইসলাম। আমার কিছুটা সিনিয়র। ফর্শা এবং সুঠাম ফিগার তবে কিছুটা বেটে এবং টেকো।

নাজুভাই ছিলেন আমার আদর্শ এবং অনুপ্রেরণা। যেমন ছিলেন ভদ্র তেমনি ছিলেন স্মার্ট এবং মেধাবী। প্রত্যাশিতভাবেই এসএসসিতে ছিল ফার্স্ট ডিভিশন। নাজুভাইয়ের আউটলুক ছিল ব্রড এবং অ্যাম্বিশন ছিল বরাবরই উচু। ওনার টার্গেট ছিল বুয়েট। আমাকে প্রায়ই বলতেন, আলম শোন, বুয়েটে ভর্তি হতে না পারলে জীবনটাই মূল্যহীন।

বুয়েট শব্দটি নাজুভাইয়ের কাছেই প্রথম শোনা। যাই হোক। শেষ পর্যন্ত নাজুভাইয়ের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। ভর্তি হয়েছিলেন লেদার টেকনলজিতে। মাঝে মধ্যে গ্রামে নাজুভাই–এর সঙ্গে আমার দেখা হতো। তিনি ঢাকার গল্প শোনাতেন।

ফান করে বলতাম, আপনার ভালোই হবে, লেদার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এমন জুতা তৈরি করবেন যার ভেতরে ঢুকে আপনি বিনা ভাড়ায় বাড়ি আসতে পারবেন।

নাজুভাই মুচকি হাসতেন এবং প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলতেন, না আলম, আমাকে বড় হতেই হবে।

আসলে উচ্চাভিলাষী নাজুভাইয়ের কাছে লেদার টেকনলজির ঢিমেতালের ছাত্র জীবন ও ভবিষ্যৎ মোটেই আকর্ষণীয় ছিল না। বড় হতে হলে তাকে বিদেশ যেতে হবে এ ভাবনাই পেয়ে বসেছিল। আচমকা খবর

পাঠালেন গ্রামে। বাবা-মা প্রমাদ গুণলেন অজানা আশংকায়। পড়াশোনা অসম্পূর্ণ রেখে এতোগুলো টাকা খরচ করে বিদেশ যাওয়া কতোটুকু যুক্তিসংগত আর টাকা সংগ্রহ মানেই তো ওই সামান্য জমিটুকু নষ্ট করা। শেষ পর্যন্ত ছেলের প্রবল ইচ্ছা এবং যুক্তির কাছে হেরে গেলেন বড় আব্বা।

নাজুভাই এলেন গ্রামে। কয়দিন পরেই বেলজিয়াম যাবেন স্টুডেন্ট ভিসায়। ছুটি কাটাতে আমিও গ্রামে। হঠাৎ ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বড় আব্বার বড় ছেলে বাচ্চুভাই দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। অবস্থা আশংকাজনক। প্রত্যন্ত গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু বাচ্চুভাইকে বাচাতেই হবে।

কালবিলম্ব না করে আমি আর নাজুভাই প্রথমে ভ্যান এবং পরে বাসে বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বাচ্চুভাইয়ের রক্তাক্ত দেহ আমার এবং নাজুভাইয়ের কোলের ওপর। পথ আর শেষ হয় না।

অসহ্য যন্ত্রণায় বাচ্চুভাইয়ের করুণ অনুরোধ, তাদের পায়ে ধরি, তোরা বাস থামা। আমাকে এখানেই মরতে দে। আর যে পারছি না।

মন শক্ত করি। শেষ পর্যন্ত হাসপাতাল পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম হই।

দীর্ঘ দশ ঘণ্টা যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাচ্চুভাই সে যাত্রা রক্ষা পান।

কয়দিন পরেই নাজুভাই বেলজিয়ামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ১৯৮৮ সালের কোনো এক শুভ অথবা অশুভ লগ্নে। চিঠি আসে। টাকা আসে। বাবা-মা, ভাই-বোন খুশি হয়। আমরাও খুশি হই নাজুভাইয়ের পাঠানো আইফেল টাওয়ারের সুন্দর ভিউকার্ড পেয়ে।

কি হলো, বছর দুয়েকের মাথায় লন্ডন পাড়ি জমালেন নাজুভাই। সেখান থেকে নিয়মিত চিঠি এবং টাকা আসতে থাকে। এভাবে বছর দুই-তিন। হঠাৎ চিঠিতে আশংকার ডংকা বেজে ওঠে। তিনি বিপদে আছেন। বন্ধুবান্ধবরা প্রতারণা করেছেন। দেশে আসতে চান। কিন্তু পারছেন না।

ছবি পাঠালেন। কংকালসার নাজুভাইকে চেনা যায় না। এরপরই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। লন্ডন থেকে চিঠি ফেরত আসে। নাজুভাইয়ের চিঠিও আসে না। আমরা প্রমাদ গুণি।

বছর দুই পর ১৯৯৫ সালে হঠাৎ ঢাকার বাসায় একটা ফোন আসে। বড়আপা ফোন ধরেন। বলেন, লন্ডন থেকে নাজু।

ব্যস্ত হয়ে কান লাগাই।

ওপ্রান্ত থেকে এক নিঃশ্বাসে বলে যান, আলম, তুমি চিন্তা করো না। তোমাকে আনার চেষ্টা করছি। লাইন কেটে যায়।

ভিন্ন আঞ্চলিক টান এবং স্বর অন্য রকম মনে হলো। আমার সন্দেহ হয় এটা নাজুভাই কি না। যাই হোক। ওই সর্বশেষ যোগাযোগ।

বৃদ্ধ বাবা-মা পথ চেয়ে বসে থাকেন। মিনতি করেন, বাবা, তুই দেশে চলে আয়, তোর টাকা-পয়সা চাই না।

কিন্তু বাবা-মায়ের ডাক তার কানে পৌছায় না। নাজুভাই কি বেচে আছেন? তিনি কি জেলে? না অন্য কিছু? কেউ জানে না। মাঝে লন্ডনে এক আত্মীয়কে অনুরোধ করলেও ফল হয়নি।

তাহলে কি প্রাণের টুকরো সন্তানকে কোনোদিন খুজে পাবেন না? অন্তত তার লাশটি? জবাব নেই কোথাও। বড় আব্বা এক বুক ব্যথা নিয়ে চলে গেলেন পরপারে।

আর বাচ্চুভাই? বাচ্চুভাইয়ের করুণ ফরিয়াদ, ওরে, তোরা ওকে ফিরে আসতে বল।

কিন্তু মানুষের জীবনী শক্তি সীমিত। শোকে, টেনশনে বাচ্চুভাইও পরাজিত হন। অকালেই চলে যান পরপারে।

আর বড় আম্মা? তিনি এখন পাথরের মূর্তির মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। হয়তো বুঝেছেন, নিরাশায় অগ্রিম দেহত্যাগ করার চেয়ে নিরন্তন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু আর কতোদিন? দেড় যুগ ধরে এক দুঃখিনী মায়ের একটিই ফরিয়াদ, আমার বাবার একটু খবর এনে দাও।

বৃটেনে কোনো সহৃদয় ভাইবোন কি আছেন যিনি নাজুভাইয়ের হদিস জানেন?
নাজুভাইয়ের সর্বশেষ ঠিকানা ছিল :

MD. NAZIRUL ISLAM
20-24, BROAD STREET
HARLESTON
NORFOLK-IP20-4AZ
U.K.

বাংলাদেশে যোগাযোগের ঠিকানা : এএনএম জাহাঙ্গীর, অ্যাডভোকেট, বগুড়া জজ কোর্ট। ফোন : ৮৮০ (৫১) ৬৬৫৫০।

বেইজিং, চায়না থেকে

E-mail : alam643@hotmail.com

চেইন

– যুবরাজ সেলিম রাজ

টিভি দেখতে বসেছি। দেখতে দেখতে এক সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম *সুখবর সুখবর*। এই মাত্র ঈদের চাদ দেখা গেছে। আগামীকাল ঈদুল ফিতরের নামাজ যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

বিশেষ ঘোষণাটি শোনামাত্রই আমার শীতল শরীর ধীরে ধীরে গরম হতে লাগলো। এক সময় শরীর থেকে ঘাম ঝরছে। মনে হয় রক্ত চাপ দিচ্ছে।

বাসায় আর দেরি না করে চটজলদি বাইরে বের হয়ে রাস্তায় হাটতে লাগলাম। চারদিকে কেনাকাটার ধুম লেগে গেছে। সব মানুষের মুখে আনন্দের ঝিলিক দেখা যাচ্ছে আর পটকার ঢুস– ঢাস শব্দ।

ঈদের চাদ দেখে মুয়াজ্জিন বার বার ঈদের তকবির হাকছেন। সেই ধ্বনি শুনে আমিও মনে মনে গুনগুনিয়ে তকবির পাঠ করতে লাগলাম। কিন্তু আবোল–তাবোল ভাবে।

রাস্তা দিয়ে হাটছি আর ওপারে থাকা বাবাকে বক বক করে কথা বলেও ক্ষান্ত হচ্ছি না।

বাবা, তুমি আমাদের একা ফেলে কেন চলে গেলে, কেন? তুমি ফিরে এসো বাবা, ফিরে আসো। তুমি আজ বেচে থাকলে সংসারের সব ভার আমাকে বহন করতে হতো না।

ছোট ভাইবোনেরা আমাকে বার বার বলেছে, দাদা, এবার ঈদের নতুন জামা কিনে দেবে।

আমিও বলেছি, হ্যা, কিনে দেবো।

আমি আসার সময় মা বললেন, সেমাই, চিনি নিয়ে আসতে।

কিন্তু বাবা, এসব কিনতে টাকা পাবো কোথায়?

উত্তর, এতো যন্ত্রণা বাবা!

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। হাটতে হাটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে বসে চা সিগারেট খাচ্ছি আনমনে।

হঠাৎ করে চোখে পড়লো ঈদের আমেজে জমজমাট জুয়া খেলা বসেছে। ভাবলাম থানায় একটা টেলিফোন করে দিই। পুলিশ এলে সবাই দেখে পালিয়ে যাবে। সেই সুযোগে পটে রাখা পঞ্চাশ ও পাচশ টাকার নোটগুলো দুই হাতে মুঠ করে নিয়ে দৌড় দেবো। এই টাকা দিয়ে ঈদ খরচ করে বাচবে। আবার ভাবলাম, না, ওসব অসৎ টাকা।

এখন কি করবো! কোথায় পাবো টাকা। আমার সে চিন্তায় মাথা ঘুরপাক খাচ্ছে। ঠিক করলাম কারো কাছ থেকে ধার নেবো। ধার দিতে না চাইলে তার দুই পা জড়িয়ে ধরে কাদবো। টাকা দেয়া না পর্যন্ত পা ছাড়বো না।

কিন্তু কার কাছে যাবো? তেমন আমার কোনো বন্ধু নেই যাদের কাছে টাকা পাওয়া যাবে।

অয়নীর কথা আমার মনে পড়লো। সে বড়লোকের মেয়ে। তাকে বললে সে হয়তো ব্যবস্থা করে দিতে পারে। কিন্তু তাকে বললে আমার মাথা হেট হয়ে যাবে। এমন সময় মৃদু এসে বললো, আংকল, আপনাকে সেই কখন থেকে খুজছি।

কেন?

আন্টি একবার দেখা করতে বলেছে।

মৃদুর কথা শুনে আরো নিস্তেজ হয়ে গেলাম। কারণ প্রতি ঈদের রাতে আমরা দুজন দেখা করি এবং দুজনে দুজনাকে গিফট দিয়ে থাকি।

এবার আমার একদম হাত খালি। এখন পর্যন্ত বাড়ির খরচ করতে পারিনি। তার উপর অয়নীর গিফট চিন্তা বাড়লো। সব কিছু আমার অসহনীয় লাগছে।

এই সময় কেউ যদি আমাকে পাচ হাজার টাকা দিয়ে বলতো, তোমার একটি কিডনি দিতে হবে, তাহলে ত্বরিত গতিতে দরকার হলে লিখিত দিয়ে টাকাটা নিতাম।

আজ আমার ভাগ্য আমাকে নিয়ে উপহাস করছে। সামান্য কাগজের একটা নোট, অথচ তার দাম অনেক।

এই টাকার জন্য মনে হয় ঈদে এক চামচ সেমাই জুটবে না। ছোট ভাইবোনদের জামা, মায়ের শাড়ি কিনে দিতে পারবো না। মনের মানুষকে হারানোর ভয়। খুব কষ্ট হচ্ছে আমার। বুকের ভেতর চিন চিন করছে। কান্না পাচ্ছে ভীষণ। কিন্তু কাদতে পারছি না। সব কিছু নীরবে শুধু সহ্য করতে হচ্ছে।

গিফট ছাড়া অয়নীর সামনে দাড়াতে সংকোচ হচ্ছে আবার যদি দেখা না করি, হয়তো সে ভাববে গিফট দেয়ার জন্য দেখা করতে আসিনি।

কিছুটা ইতস্তত করে তার সামনে দাড়ালাম।

সে আমাকে দেখে এক পশলা হাসলো। দেখতে পেলাম তার হাত দুটি পেছনে কি জানি একটি জিনিস মুঠ করে ধরে আছে। মনে হয় গিফট। সে আমাকে চোখ দুটি বন্ধ করতে বললো।

তার কথায় চোখ দুটি বন্ধ করলাম।

আমার চোখে পানির যে জমাট বেধেছিল চোখ বন্ধ করামাত্রই তা ঝরে পড়লো। পাজামা পাঞ্জাবির গিফটটা এগিয়ে দিয়ে বললো তোমার চোখে পানি। তোমার কি হয়েছে?

ও কিছু না। চোখে পোকা পড়েছে, তাই চোখ দিয়ে পানি ঝরছে।

পোকা পড়লে একটি চোখে পড়বে। একটি চোখ দিয়ে পানি ঝরবে। কিন্তু তোমার দুটি চোখ দিয়ে পানি ঝরছে। তোমার নিশ্চয়ই কোনো কিছু একটা হয়েছে যা তুমি আমার কাছে আড়াল রাখার চেষ্টা করছো। আমাকে তুমি সব কিছু খুলে বলো। তোমার সুখেই আমি সুখী, তোমার দুঃখে আমি দুঃখী, তা তুমি কেন বোঝো না।

অয়নী কাদতে কাদতে হুট করে আমার মাথার ওপর হাত রেখে বললো, তুমি আমাকে সত্যি করে বলো। আর যদি না বলো তাহলে আমার যেন এক্ষুনি মরণ হয়।

অয়নীর এমন কথা শুনে আমিও কেদে ফেললাম। তবে কারো কান্নায় সাড়াশব্দ নেই।

অয়নীর আকুতিতে তাকে সব কিছু খুলে বললাম।

আমার কথা শুনে সে এবার একটু শব্দ করে কাদতে লাগলো। তারপর এক সময় তার গলার সোনার চেইন খুলে আমার হাতে দিয়ে বললো, তোমার এখন বিপদ। তুমি এটা রাখো। পরে না হয় এর চেয়ে দামি একটা চেইন দিও।

তার কথায় আমিও নির্লজ্জের মতো হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে চেইনটি নিলাম।

চেইনটা বিক্রি করে ছোট ভাইবোনদের জামা, মায়ের শাড়ি, সেমাই, চিনি, ইত্যাদিতে খরচ করলাম।

ঈদের দিনে সবাই নতুন পোশাক পরেছে। আমিও অয়নীর দেয়া পাজামা পাঞ্জাবি পরে ঈদের নামাজ পড়তে যাচ্ছি। এমন সময় মা বললেন, বাবা, এতো টাকা কোথায় পেয়েছিস?

বললাম, মা আগে ঈদের নামাজ পড়ে আসি।

দুয়ানিপাড়া, হারাগাছ, রংপুর থেকে

অপেক্ষা

– মোহাম্মদ শামীম হোসেন

এলাকার স্কুল থেকে এসএসসি পাস করি ১৯৯৯ সালে। ভর্তি হই রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজে। কলেজ জীবন সুখের ছিল না। সারা দিন মেসে বসে কৃকেট খেলা দেখতাম। তাছাড়া নতুন শহরে কোনো গাইড ছিল না। ভেবেছিলাম প্রেম করবো, তাও ভাগ্যে জুটলো না।

২০০১ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করি। এতে আমি সন্তুষ্ট হইনি। তাই আবার পরীক্ষা দিলাম ডিভিশন উন্নয়নে। ফল ভালো হলো না, আবারও একই রেজাল্ট। ভালো জায়গায় বা ভালো সাবজেক্টে চান্স না পাওয়া একেবারে ভেঙে পড়ি।

সবাই আমাকে তিরস্কার করতে শুরু করলো।

আমার কষ্ট বেড়ে গেল, আমি এখন কি করবো। ওই সময় একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়লো। বিনা বেতনে কমপিউটার সায়েন্সে ভর্তি করানো হবে। তবু জানতে পেলাম চার বছরে মোট খরচ এক লাখ দশ হাজার টাকা।

আব্বা ও আম্মাকে বলতেই রাজি হলেন।

ভর্তি হয়ে গেলাম ওই বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে যার নাম এখনো আছে লালমাটিয়ায়, *নর্থ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি।*

আমরা ভর্তি হই মোট পঞ্চাশজনের মতো। তিন মাস পর জানতে পারলাম এই ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করলে বাংলাদেশ সরকার কোনো দাম দেবে না। কারণ এটা কোনো অনুমোদনই পায়নি।

সবাই তখন চলে গেল বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিতে।

আমি ও কয়েকজন চলে এলাম বাড়িতে।

আরো দ্বিগুণ কষ্ট মনের ভেতর। এতো টাকা খরচ করলাম। কিন্তু পড়াশোনার কোনো উন্নতি হলো না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সেও ভর্তি হইনি। এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।

২০০১ সালে এইচএসসি পাস করলাম, ২০০৩ সালেও কোনো জায়গায় ভর্তি হওয়া হলো না। বুঝতেই পারছেন আমার অবস্থা!

ভাগ্য ভালো ২০০১ সালে মান্দা কলেজে পাস কোর্সে ভর্তি হওয়া ছিল বিএসসি-তে। তিন বছরের কোর্সের পরীক্ষা শুরু হয় ২০০৫-এর জানুয়ারিতে। পাস করি সেকেন্ড ডিভিশনে ২০ জুলাই ২০০৫-এ।

এই ছিল আমার কষ্টের শিক্ষাজীবন। আরো যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তা বলার ভাষা নেই। জীবন তো শুধু যন্ত্র নয়, এর মধ্যে রয়েছে ফুলের ছোয়া।

রিনির একই এলাকায় বাড়ি যার স্পর্শ ছাড়া আমার একদণ্ড ভালো লাগে না। তার সান্নিধ্য ছাড়া মরুভূমি হয়ে যাই। সেই রিনিকে আমার নিজের মতো করে চেয়েছি। কিন্তু পাইনি।

আমার যেদিন বিএসসি রেজাল্ট প্রকাশ হয় সেদিন রিনিকে দোকান থেকে মোবাইল করলাম। জানালাম আমার রেজাল্ট।

কিন্তু সে নিরুত্তাপ, কোনো উৎসাহ, আবেগ ছিল না।

তা দেখে খুবই কষ্ট পাই। আমিও তাকে ভুলতে চেষ্টা করি।

হঠাৎ একদিন সে আমাকে অবাক করে দিয়ে ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের বাড়িতে উপস্থিত।

মা তাকে বসতে দিয়েছেন, চা দিয়েছেন। অনেকক্ষণ ধরে গল্প করেছেন।

আমার রেজাল্ট শুনে সে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিল। দুঃখের বিষয়, সেদিন বাড়িতে ছিলাম না। আমার মা আবার খুবই গরম মেজাজি লোক। কিন্তু মাও আমাকে কোনো বকা দিলেন না।

মা আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, যে মেয়েটা এসেছিল সে, তার পুত্রবধূ হওয়ার উপযুক্ত।

যেন আকাশ থেকে পড়লাম। মা, হ্যা আমার মা এমন কথা বলতে পারেন না। তাকে দেখে আব্বা, এমনকি পাড়ার সবাই ভয় পায়। আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না।

তবু ভয়ে ভয়ে বললাম, মা, রিনিরা অনেক ধনী, তাদের ভালো বাড়ি, গাড়ি আছে। আমার তো চাকরি, গাড়ি, এমনকি একটা মোটর সাইকেল, মোবাইল ফোন পর্যন্ত নেই।

মা আমাকে সাহস দিলেন, নেই তো কি হয়েছে। তোর বাড়ি আছে, এবার গাড়ি হবে, সব কিছু হবে।

কিন্তু রিনি কি ততোদিন অপেক্ষা করবে! আমার সঙ্গী হওয়ার জন্য কি সে এতো দিন অপেক্ষা করতে পারবে?

বার্দ্দপুর, মৈনম, নওগা থেকে

আগুন আর মোম

– এসআর আমিন

আমি প্রথম যেদিন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই সেদিনই হাসানকে আমার খুব ভালো লেগে যায়। পরে আস্তে আস্তে তার প্রতি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ি। তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে খুব কম সময় লাগে।

হাসান দেখতে সুপুরুষ। সেই জন্য সব সময় তার পেছনে দুই একটা মেয়ে ঘুর ঘুর করতো। তার সঙ্গে যখন যে থাকতো তার সঙ্গেই সে প্রেমের অভিনয় করতো।

আমি জিজ্ঞাসা করলে বলতো, অন্যদের সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না। তুমি তুমিই। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারি?

আমি ছিলাম সহজ সরল গ্রাম্য মেয়ে। তার কথা বিশ্বাস করতাম। কোনো দিন তাকে পর ভাবিনি। তাকে আত্মার আত্মা বলেই জেনেছি।

লাস্ট ইয়ারের অনেক মেয়েরা আমাকে হাসানের সঙ্গে না মেশার জন্য উপদেশ দিতো।

তাদের কথা মোটেও শুনতাম না।

আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী তখন এক গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বাড়ি আসার প্রস্তুতি নিচ্ছি, সেই সময় হাসান এসে আমাকে বললো, বাড়ি গিয়ে কি করবে। তারচেয়ে চলো কক্সবাজার ঘুরে আসি।

বললাম, আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই।

সে বললো, টাকার চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। আমি সব ম্যানেজ করে নেবো।

দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। কারণ তাকে এতোই ভালোবাসি, তার কথা ফেলতে পারি না।

চিন্তিত দেখে সে বললো, তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।

আমরা থাকবো কোথায়?

হোটেলে থাকবো।

দুজন এক রুমে?

দুজন দুই রুমে থাকবো।

আমি বাড়ির প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে চলে গেলাম কক্সবাজারে। সেখানে গিয়ে প্রথম দুই দিন দুজন দুই রুমে থাকলাম। পরের রাতে হাসান আমার রুম থেকে তার রুমে যেতে চাইলো না। বললো, দুই দিন পরেই তো আমরা স্বামী–স্ত্রী। বিয়ের আগে একটু এনজয় না করলে হয়?

বলেই সে আমাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলো।

তারপর সারা রাত নিজেকে তার হাতে সপে দিলাম।

প্রতি রাতে আমরা দুজনে মিলিত হতে থাকি। এভাবে এগারো দিন চলার পরে একদিন সকালে টাকা পয়সা নিয়ে ঢাকায় ফেরার জন্য মালামাল কেনার উদ্দেশ্যে মার্কেটে যাচ্ছি সেই সময় আগে আমাদের তিনজন ছিনতাইকারী সব ছিনিয়ে নেয়। পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই রইলো না।

এখন উপায়?

হোটেল ভাড়া তিন হাজার টাকা ঢাকায় ফিরতে গাড়ি ভাড়া দেড় হাজার টাকা। মোট সাড়ে চার হাজার টাকা। পাবো কোথায়? এখানে তো কোনো পরিচিত মানুষ নেই।

হোটেলের ম্যানেজারকে বললাম, আমরা ঢাকায় গিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেবো। অনেক অনুনয়– বিনয় করে বললাম। কিন্তু কোনো কাজ হলো না।

তিনি বললেন, টাকা দিয়ে এখান থেকে পা বাড়াও। তা না হলে পুলিশে খবর দেবো।

পুলিশের কথা শুনে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল।

ম্যানেজার এবং হাসান ভেতরে চলে গেল।

পাচ মিনিট পরে ম্যানেজার ফিরে এসে বললো, টাকা হবে, নাকি পুলিশে খবর দেবো?

তার পা জড়িয়ে ধরে বললাম, আপনি আর যা পারেন করেন, পুলিশে খবর দেবেন না।

তিনি বললেন, একটা পথ আছে, যদি তুমি রাজি থাকো তাহলে বলবো আর যদি রাজি না থাকো তাহলে আমার করার আর কিছুই নেই।

আপনি যে পথে নেবেন সেই পথে যেতে রাজি আছি।

তিনি বললেন, আজ রাতে একজনর গেস্ট আসবে আমাদের এখানে। তাকে এনজয় করাতে পারলে তোমাদের হোটেল ভাড়া পরিশোধ হয়ে যাবে।

দুই দিন দুজনকে এনজয় করাতে পারলে ঢাকায় যাওয়ার টাকাও দিয়ে দেবো। চিন্তা করে দেখো তোমার মত হয় কি না।

গভীর চিন্তায় পড়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, হাসান সাহেব কিছুই বলবেন না।

পরে হাসান এসে বললো, তুমি রাজি হয়ে যাও। আমি তোমাকে পবিত্র বলেই জানবো এরপর থেকে। তুমি আর না করো না লক্ষীটি। পুলিশ জানলে দুজনার ছবিসহ পেপারে খবর চলে যাবে।

আমি হ্যা না কিছু বলার আগেই হাসান রুম থেকে বের হয়ে গেল।

তারপর একটা মহিলা এসে আমার হাত ধরে একটা রুমে নিয়ে সমস্ত কাপড় খুলে একটা ছোট প্যান্ট পরিয়ে হালকা মেকআপ দিয়ে চলে গেল।

তার তিন মিনিট পর একজন বিদেশি এসে আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে খাটের ওপর টেনে নিয়ে যা করলো তা লেখার ভাষা আমার জানা নেই।

এভাবে দুই দিন চলার পর আমরা ঢাকায় ফিরে এলাম। আমার প্রতি হাসানের কোনো ঘৃণা বা কোনো অবহেলা বুঝলাম না। সে এ রকম ঘটনা যেন সব সময় চোখে দেখে বা সে ঘটিয়ে থাকে এমনই ভাব।

তার তিন মাস পরে হাসান আবার আমাকে কক্সবাজার যাবার জন্য বলে।

কিন্তু যেতে রাজি হই না।

তারপর সে আমাকে যা দেখালো তা বিশ্বাস করা যায় না। ওই রাতে হোটেলের রুমে রানিং ক্যামেরা সেট করা ছিল। সেই ফিল্ম ভিসিআর আমাকে দেখিয়ে বললো, যদি তুমি আমার সঙ্গে না যাও তাহলে এই ফিল্ম বাজারে ছেড়ে দেবো। আর যদি তুমি যাও তাহলে তোমাকে ফেরত দেবো।

মান সম্মান বজায় রাখার জন্য তার সঙ্গে আবার গেলাম। সেখানে আমরা পনেরো দিন থাকলাম এবং পনেরো দিনই আমাকে দিয়ে দেহ ব্যবসা করানো হলো।

অবশেষে ফিল্মও আমাকে ফেরত দিল। সেটা পুড়িয়ে ফেললাম।

তার ছয় মাস পর আমার খুব কাশি হলো। সে কাশি আর সারে না।

ডাক্তার রক্ত এবং কফ পরীক্ষা করে বললো, তুমি এইচআইভিতে আক্রান্ত।

শুনেই আমার মাথা ঘুরে গেল।

সেদিন থেকে আমার খাওয়া-দাওয়া বদলে গেল। আমার বেচে থাকার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। সর্বদা আমার মাথায় একই চিন্তা।

তারও কিছুদিন পর আমার মাথায় এক বুদ্ধি এলো। কুবুদ্ধি, না কি সুবুদ্ধি সেটা পাঠকরা বিবেচনা করবেন।

নারী আগুন আর পুরুষ মোম। মোম আগুনের ছোয়া পেলেই গলে যাবে।

হাসানের সঙ্গে মিশতে যারা আমাকে নিষেধ করতো তাদের এক এক করে সবার কাছে শুনলাম অনেকেই আমার মতো অত্যাচারের শিকার। এটাই নাকি তার ব্যবসা। এতে সে প্রচুর টাকা পায়।

আমার জীবন তো শেষ। এখন মৃত্যুর জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। তবে হাসান এবং ওই ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়েই মরবো। আমি মরবো আর তারা সারা জীবন মেয়েদের এভাবে সর্বনাশ করবে? তা হবে না।

পরদিন সকালে হাসানকে বললাম, আবার কবে যাবো কক্সবাজার?

সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকার একটা হোটেলের রুমে গেল এবং বললো, এখন থেকে তুমি আর আমি সপ্তাহে একদিন এখানেই মিলিত হবো। সব সময় কক্সবাজারে না গেলেও চলবে।

বললাম, দুই দিন হলে ভালো হতো।

সে বললো, এভাবে চলতে তোমার ভালো লাগে?

হেসে বললাম, যে পথ তুমি দেখিয়েছো সে পথ ভালো না লেগে পারে?

ঠিক হলো প্রতি মাসে পাচ দিন কক্সবাজার থাকবো আর বাকি দিনগুলো ঢাকায়।

একদিন হাসান বাদে একা কক্সবাজারের সেই হোটেলে হাজির হলাম এবং ম্যানেজারকে একা দেখে অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় তার পাশের চেয়ারে বসলে কিছুক্ষণ পর তিনি আর থাকতে পারলেন না। আমার কাছে এসে প্রথমে বুকে, পরে অন্যান্য স্থানেও হাত বোলাতে শুরু করলেন।

কোনো বাধা না দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম।

তিনি আমাকে পুরোপুরি উপভোগ করলেন।

সেদিন ফিরে আসার সময় বললাম, আপনি যদি আমাকে এভাবে একটু শান্তি না দেন তাহলে আর আসবো না। আমার টাকা পয়সা কিছুই লাগবে না। আপনার যতো কাস্টমার আসুক তাদের কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা কিছুই নেবো না। সব আপনার থেকে যাবে।

ম্যানেজার আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালে তাকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু দিয়ে চলে আসার জন্য পা বাড়ালে তিনি বললেন, তোমার শর্তে রাজি।

এভাবেই দিন চলছিল।

চার মাস পর হাসানের আর কোনো খোজ নেই। তার সঙ্গে আমার দেখা হয় না। আমি তাকে হন্যে হয়ে খুজতে থাকি।

হঠাৎ একদিন হাসানকে হাসপাতালে দেখে এগিয়ে গেলাম। হাসান দাড়িয়ে আছে কোনো কথা বলছে না। তার একজন বন্ধু বললো, হাসান আর বাচবে না। সে এইচআইভিতে আক্রান্ত।

শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি। আমার হাসি দেখে তো সবাই অবাক, হাসি আর থামতে চায় না।

অনেকক্ষণ পর হাসি থামিয়ে দাতে দাত চেপে বললাম, অনেক জীবন বাচবে এবার। অনেক জীবন যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাবে।

পরে ম্যানেজারের সঙ্গে নিয়মিত মিলিত হই। মাসে চার পাচ দিন।

হঠাৎ একদিন দেখি ম্যানেজার বিষণ্নমুখে বসে আছে। তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছে। আমি দূর থেকে দেখেই বুঝতে পারি তারও ধরা পড়েছে। আমি ফিরে আসি।

এখন ভাবি সারা দিন।

এখন মরলেও আমার আত্মা শান্তি পাবে।

মনিরামপুর, যশোর থেকে